# ভাগবত রত্নাবলী

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# সূচীপত্র

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক সমৃদ্ধ মহাকাব্য শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ভক্তিপথের সাধকদের জন্য এক অমূল্য সম্পদরূপে সতত স্বীকৃত। সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যে মহামতি বেদব্যাস বেছে নিয়েছিলেন পুত্র ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেবকে কারণ তিনি পুত্ররূপে নয়, পাত্ররূপে উৎকৃষ্ট ছিলেন। অমৃত পরিবেশনের সময়ে সতত প্রয়োজন আধার, নির্মল ও পবিত্র হওয়া। সেই ধারা অব্যাহত রেখে মহাত্মা শুকদেব বিতরণের সময়ে আরো এক উৎকৃষ্ট আধার বেছে নিয়েছিলেন ; তিনি হলেন পরম জ্ঞানীদের সভায় গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট মহারাজা পরীক্ষিৎ।

মহামতি বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীভগবানের যশ ও মহিমা সবিস্তারে উপহার দিয়েছেন কারণ 'ব্যাস' কথার অর্থ যে বিভাজন করে। তিনি বেদকে বিভাজন করে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব নাম দিয়ে বেদব্যাস নামে পরিচিত হন। আর ইতিহাস বা পুরাণকে তো পঞ্চম বেদ বলা হয়। শ্রীবেদব্যাসের জন্ম যমুনার 'কৃষ্ণ' নামক দ্বীপে তাই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নও বলা হয়।

মহাকাব্য শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের নামের মধ্যেও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ভাগবত শব্দের চারটি অক্ষর ভ, গ, ব ও ত যেন ভক্তি, জ্ঞান, জ্ঞান, বৈরাগ্য আর ত্যাগ-তিতিক্ষার অর্থ বহন করে। তাই ভাগবত মহাকাব্য রত্ন ভাণ্ডারে যেন এই সকল অমূল্য রত্নরাজিরূপে থরে থরে সাজানো দেখা যায়। 'শ্রীমদ্' কথার মধ্যে আমরা দেখতে পাই মদনের সৌন্দর্য যা এক কথায় অনিন্দ্যসুন্দর। যে কাব্যে অষ্টাধিক ভাগ বর্তমান থাকে তাকে মহাকাব্য বলা হয়ে থাকে। দ্বাদশ স্কন্ধ বিশিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত তাই মহাপুরাণ রূপে স্বীকৃত। এই মহাপুরাণ সাধককে ত্রিবিধ 'ম'—মদ, মোহ, মাৎসর্য

থেকে মুক্তি দেয়। এই শ্রীমদ্ভাগবতকে শ্রীভগবানের নির্মল যশঃকীর্তন ও মহিমা সংকীর্তন সমন্বিত বলে মর্ত্যলোকের অমৃত বলা হয়।

অনন্ত জ্ঞানী ব্যাসদেবের শুকদেবকে অমৃত সংরক্ষণের আধাররূপে বেছে নেওয়ার একটা কারণ তো তিনি উত্তম আধার। ব্রহ্মজ্ঞানী মহাত্মা শুকদেবের নামের মধ্যেও এক বিশেষত্ব দেখা যায়। আমরা জানি শুক সুমিষ্ট ফল ছাড়া চঞ্চু প্রহার করে না সুতরাং সুমিষ্ট সুপক্ক ফলে চঞ্চু প্রহার করলেই সেই ফলের রস অমৃত ধারারূপে প্রবাহিত হয়। তাই সুমিষ্ট অমৃত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বিতরণের ভার মহাত্মা শুকদেবের হাতে অর্পণ করা হয়েছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ স্বয়ংও গুণগ্রাহী শ্রোতা কারণ তিনি তো জন্মের পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিলেন, তাই তাঁর হরিনাম সংকীর্তন শ্রবণ করবার ইচ্ছা থাকাই তো স্বাভাবিক। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে অশ্বত্থামা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাণ্ডবদের শেষ বংশধর অভিমন্যুভার্যা উত্তরার গর্ভের সন্তানকে বধ করবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। উত্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করবার জন্য আর্তি জানিয়েছিলেন। শ্রীভগবান তখন উত্তরাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি তাঁর গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করবেন। অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলে শ্রীভগবান উত্তরার গর্ভে উপস্থিত থেকে সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই গর্ভস্থ সন্তানকে রক্ষা করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই জন্মের পূর্বের দেখা শ্রীভগবানকে জন্মলাভের পরও অন্বেষণ করতেন তাই তাঁর নাম হয়েছিল পরীক্ষিৎ।

কৃষ্ণ ভক্ত পরীক্ষিৎ রাজা রূপে ধর্মপরায়ণ, সাধু এবং ব্রাহ্মণদের সেবক ও প্রজাবৎসল ছিলেন। কিন্তু তার একটি অসদাচরণ তাঁর জীবনে চরম দুর্যোগ ডেকে এনেছিল। তিনি মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত হওয়ায় শমীক ঋষির আশ্রমে প্রবেশ করে সমাধিস্থ ঋষির কাছে তৃষ্ণা

নিবারণের জন্য জল প্রার্থনা করেছিলেন। ঋষির কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে তিনি একটি মৃত সর্প ধনুকের প্রান্ত দিয়ে তুলে সমাধিস্থ ঋষিকে অপমান করেছিলেন। শমীকনন্দন ঋষি শৃঙ্গী তাতে কুপিত হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে সপ্তম দিবসে তক্ষক দংশনে পরীক্ষিতের মৃত্যু হবে। পরে রাজা বুঝতে পারলেন যে তাঁর পক্ষে এই কাজ সঙ্গত নয় তখন তিনি প্রায়শ্চিত্ত করবার কথা চিন্তা করলেন কারণ প্রজারা তো সকলেই রাজার আচরণের অনুকরণ করে থাকে। প্রাতঃকালেই তিনি পুত্রকে ডেকে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন আর তাপস বেশে গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশনে বসেছিলেন। সেই পবিত্র গঙ্গাতীরে মহারাজের প্রায়োপবেশনের কথা জানতে পেরে বহু বিশিষ্ট মুনিঋষিগণ তথায় উপস্থিত হয়েছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে মহামুনি অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, দেবল, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ব্যাসদেব, পরাশর আদি ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ উপস্থিত মুনিঋষিদের কাছে ভগবৎ কথা শ্রবণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তখন কেউই সেই কার্যে এগিয়ে আসেননি। এমন সময় সেই জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের সভায় ব্যাসনন্দন শুকদেবের আগমন হল। সকলেই আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞানী দিগম্বর অবধূতকে উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এইবার মহাত্মা শুকদেবকে ভগবতকথা শোনাবার জন্য অনুরোধ করলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব যখন আসনে বসলেন তখন তিনি জানতে চাইলেন যে জিজ্ঞাস্য আসলে কী ? মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—'আমাকে বলুন মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের কী করা উচিত ? সার কী ? শ্রেয় কী ? প্রেমভক্তি কেমন করে হয় ? অবতারের প্রয়োজন কী ? অবতার কত জন ? তাঁদের সময়ে ধর্ম কাদের আশ্রয়ে থাকে ?' এর উত্তরে মহাত্মা শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে যা কিছু বলেছিলেন তাই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ। ব্যাসদেব নিজ পিতৃদেব পরাশর মুনির উপস্থিতিতে দেখলেন

যে তাঁর পুত্র মহাত্মা শুকদেব তাঁর সৃষ্টিকে ভক্তগণের সম্মুখে অদ্ভুত নৈপুণ্য সহকারে উপস্থাপন করলেন। তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন। সেই ধর্মসভায় উপস্থিত সূত উগ্রশ্রবা পরে সেই গুণ ও লীলা সংকীর্তন শৌনকাদি ঋষিদের সম্মুখে এক যজ্ঞস্থলে করেছিলেন। তখন থেকেই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ভক্তিপথের সাধকদের জন্য এক আকর শাস্ত্ররূপে প্রতিষ্ঠা পেল। বস্তুত এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ শ্রীভগবানের বাঙ্ময় শরীর ; যা যুগে যুগে দলে দলে ভক্তবৃন্দকে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আমরা কত ভাগ্যবান যে শ্রীভগবান স্বয়ং আমাদের সঙ্গে সতত বাস করছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে গীতায় বলেছেন—

**ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।**
**ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥**

(গীতা ১৮।৬১)

হে অর্জুন ! অন্তর্যামী নারায়ণ সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থেকে সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়া দ্বারা পরিচালিত করছেন।

তাই এ কথা ঠিক যে শ্রীভগবান আমাদের সঙ্গে সতত অন্তরে বিরাজ করছেন। যাঁকে হারানো কখনই সম্ভব নয়, তাঁকেই আমরা তীর্থে, মন্দিরে, শাস্ত্রে খুঁজে বেড়াই। আমাদের অবস্থাকে দার্শনিক কবি এইভাবে বলেছেন :

**কস্তুরী কুণ্ডল বসৈ মৃগ ফিরে বন মায়।**
**ঐসা ঘট ঘট রাম হৈ দুনিয়া দেখৈ নায়॥**

মৃগনাভির কস্তুরীর গন্ধে পাগল হয়ে মৃগ তা সারা বনে খুঁজে বেড়ায়। তেমনই সর্বদেহে রাম বর্তমান, জগৎ ভেবে দেখে না।

ভোগৈশ্বর্যে সুখ কখনো পাওয়া যায় না, কারণ ইন্দ্রিয়গম্য সুখ তাৎক্ষণিক সুখানুভূতি দিলেও শাশ্বত সুখ দিতে সক্ষম নয়। আমরা

তাকেই পাওয়ার জন্য সারাজীবন উৎসর্গ করি।

তাই আমাদের প্রয়োজন সেই গোবিন্দের সন্ধান নেওয়া যিনি অসীম আগ্রহে দিন গুনছেন কবে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি হবে আর আমরা জানতে পারব তাঁর সাগ্রহে অপেক্ষার কথা। আমরা তাঁকে যত ভালোবাসি সেই তিনি তাঁর ভক্তকে তার সহস্রগুণ ভালোবাসেন। আমাদের সতত স্মরণ রাখতে হবে যে শ্রীভগবান ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য মীন, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ পর্যন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন, চতুর্দশ বৎসর বনবাসের অনন্ত ক্লেশ সহ্য করেছেন। তাই বোধহয় আমাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীকে চিনে নেওয়ার সময় হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরো কিছু দিন কাছেই পাওয়ার জন্য পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীর করা স্তুতি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ;

**বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।**
**ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্‌॥**

(১।৮।২৫)

হে জগদ্‌গুরু ! আমাদের জীবনে পদে পদে যেন বিপদ আসে কারণ বিপদের মধ্যেই নিশ্চিতভাবে আপনার দর্শন লাভ হয়ে থাকে। আপনার দর্শনলাভ হলে তো আর জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পড়তে হবে না।

তাই আমরা এই মানব জন্মে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করবার কামনা করি কারণ আমরা জন্ম-মৃত্যু চক্রে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর তার থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। গোবিন্দের কৃপায় আমরা মানব জন্ম পেয়েছি যাতে তিনি আমাদের তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ করবার জন্য বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। এই চিন্তা করবার শক্তি অন্যান্য যোনিতে নেই আর কত সহস্র জন্ম অতিক্রম করে আবার মানব জন্ম লাভ করব তাও ঠিক নেই। তাই যা করতে হবে তা এই মানব জন্মেই করতে হবে। এই প্রসঙ্গে ভক্ত কবির দাস বলেছেন :

**দুখ মে সুমিরন সব করৈ, সুখ মে করৈ ন কোয়।**
**জো সুখ মে সুমিরন করৈ তো দুখ কাহে কো হোয়॥**

দুঃখে সকলেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীভগবানকে স্মরণ করে আর সুখ হলেই তাঁকে ভুলে যায়। যদি কেউ সুখের সময়ে তাঁকে স্মরণ করে তাহলে দুঃখ তার কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।

শ্রীভগবানের চিন্তায় নিত্যযুক্ত হওয়ার দুই প্রচণ্ড বাধা, দর্প ও কন্দর্প। এই দুই পরম শত্রুকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারলেই তাঁর চিন্ময় রূপে তন্ময় হওয়া সম্ভব। তিনি হাত বাড়িয়ে আছেন আমাদের আলিঙ্গন করে নেওয়ার জন্য, আমাদের শুধু তাঁর দিকে দেখা প্রয়োজন। কৃপাবাতাস তো বয়ে যাচ্ছে কেবল পাল তুলে দেওয়া প্রয়োজন।

এই কলিযুগে তাই হরিনাম সংকীর্তনের পরামর্শ, কারণ অন্যান্য যুগের মতো তপস্যা, যজ্ঞ আদি এখন করা কঠিন। এর বিশেষ কারণ যে সেই সকল পথ আজ লুপ্ত হতে চলেছে আর তা সম্পাদন করবার উপযুক্ত আচার্য পাওয়াও দুর্লভ। আর তপস্যা, যজ্ঞ করবার আধারও এখন অপ্রতুল। তাই হরিনাম সংকীর্তন করে শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়াই এখন অন্যতম পথ। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ সেই গুণ ও লীলা সংকীর্তন সমৃদ্ধ মহাকাব্য। তা ভক্তকে শ্রীভগবানের কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম।

সন্ত কখনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত হন না তাই তারাই ভক্তদের সঠিক পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। এমনই এক সন্তকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন—শ্রীবৃন্দাবনে সকলেই শ্রীরাধার নাম করে থাকেন। তাহলে শ্রীমদ্ভাগবতে মহাত্মা শুকদেব একবারও শ্রীরাধা নাম নিলেন না কেন ? তাহলে কি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধাতত্ত্ব নেই ? প্রশ্ন শ্রবণ করে সন্ত কৌতুক অনুভব করলেন। ‘আরে ! শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব আর শ্রীরাধাতত্ত্ব আলাদা নাকি ? পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহলে শক্তি ছাড়া লীলা করলেন কী করে ? তাঁর শ্রীবিগ্রহই তো যুগল মূর্তি যার বামে শ্রীরাধা সতত বর্তমান।

তাঁর অনন্তশক্তির শিরোমণি হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা না থাকলে তিনি কোন শক্তিতে বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা গিরি গোবর্ধন ধারণ করে ছিলেন ? তাই তত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও শ্রীরাধাতত্ত্ব অভিন্ন। রাসলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো লীলা প্রয়োজনে বহু রূপ ধারণ করে গোপীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন। তিনি নিজ হ্লাদিনী শক্তিকে রাসলীলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবেন কেন ? তাই তিনিই শ্রীরাধা রূপ ধরেছিলেন। আর মহাত্মা শুকদেবের শ্রীরাধা নাম উচ্চারণ না করবার কারণ অতি সহজ। ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব সেই মনের অন্তর্মুখ বৃত্তির অর্থাৎ শ্রীরাধার নাম উচ্চারণ করলেই তাঁর সমাধি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তিনি তো মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীভগবানের গুণ ও লীলা সংকীর্তন করে তাঁকে মৃত্যু পূর্বেই মুক্ত করে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর তখন সমাধি হয়ে গেলে তা কি সম্ভব হোত ? তাই তিনি সযত্নে তা এড়িয়ে গেছেন।

অন্য জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ তো তার অন্য কোনো কারণও বলতে পারেন। তাই এই সম্বন্ধে আর আলোচনায় কাজ নেই। আসুন, সকলে বলি—ওঁ নমো ভগবতে ভাগবতায়।

পরমহংস তত্ত্বচূড়ামণি মহাত্মা শুকদেব উপস্থাপিত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ রত্নভাণ্ডার থেকে আহরণ করা **'ভাগবত রত্নাবলি'** শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল। তা ভগবদ্ভক্তদের আনন্দ দান করবে এই আশা রইল। 'ভক্তবৎসল' নামকে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন। তিনি কৃপা করুন, এই প্রার্থনা রইল।

**'শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু'**

বিনীত

**অরুণদেব ভট্টাচার্য**

॥ শ্রীহরিঃ ॥

# শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন

দেবর্ষি নারদ একদিন পরিভ্রমণ করতে করতে সরস্বতী নদীর তীরে পরাশরনন্দন শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের আশ্রমে উপনীত হলেন। আশ্রম পরিবেশ ছিল পবিত্র ও নির্জন। দেববন্দিত দেবর্ষি নারদকে আসতে দেখে ব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা আর পূজার্চনা করলেন। ব্যাসদেব যে কোনো কারণে চিন্তিত সেই কথা দেবর্ষি নারদের চোখে পড়ল। তিনি ভাবতে লাগলেন—যুগধর্মাদির অবক্ষয় ও পাঞ্চভৌতিক বস্তুসমূহের শক্তিহ্রাসে চিন্তিত হয়ে যে মুনিবর নিজ দিব্যজ্ঞান দ্বারা মানব চিত্ত শুদ্ধিকর যজ্ঞানুষ্ঠান বৃদ্ধি করবার জন্য বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন আর বেদপাঠে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তিদের জন্য পুরাণ, মহাভারত আদি রচনা করেছেন তাঁর তো প্রফুল্লচিত্ত থাকবারই কথা। অথচ তিনি বিষণ্ণ চিত্ত হয়ে আছেন ! অতএব দেবর্ষি নারদ এই বিষণ্ণতার কারণ জানতে চাইলেন।

দেবর্ষি নারদের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসদেব বললেন—সনাতন ব্রহ্মতত্ত্বের সূক্ষ্মবিচার সর্বসাধারণের জন্য মহাভারত মহাকাব্য রচনা করে যেন তাঁর মনে তৃপ্তির অপ্রাচুর্য বর্তমান রয়েছে। যোগানুষ্ঠান এবং নিয়মপালন দ্বারা পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম উভয়েই অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে যে অপূর্ণতা রয়েছে তার কারণ আপনি বলুন।

দেবর্ষি নারদ বললেন—হে বেদব্যাস ! শ্রীভগবানের নির্মল যশঃকীর্তন, ভগবৎ মহিমা সংকীর্তন আপনার রচনা সমূহে প্রায় অনুক্ত আছে। আমার মনে হয় শ্রীভগবান যাতে প্রীতিলাভ করেন না সেই শাস্ত্র বা জ্ঞান ব্যর্থ। আপনি ধর্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয় যেমনভাবে সংকীর্তন করেছেন তেমন ভাবে শ্রীহরির মহিমা সংকীর্তন করেননি। যে ব্যক্তি শ্রীগোবিন্দলীলা ছাড়া অন্য কিছু বলে সে তো স্বেচ্ছায় তার নাম-রূপের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বুদ্ধিতে ভেদাভেদ জ্ঞান আসায় তখন ঝড়ে পড়ে যাওয়া মাঝনদীর খেয়াসম

মন অস্থির হয়ে টলমল করতে থাকে ফলে তা স্থির রাখা সম্ভব হয় না।

হে পরাশরনন্দন ! আমি জানি যে আপনি অভ্রান্ত দ্রষ্টা আর শ্রীভগবানের কলাবতার। আপনার জন্ম কেবল জগৎকল্যাণ হেতু হয়েছে। অতএব আপনি শ্রীহরির লীলাসকল সবিস্তারে সংকীর্তন করুন। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিদের মতে গোবিন্দলীলা ও গোবিন্দগুণ সংকীর্তনই জীবের একমাত্র তপস্যা ; বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, স্বাধ্যায়, জ্ঞান ও দান সকলই এই উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আপনাকে এই সময়ে আমি একটি ইতিহাস বলতে চাই যা শ্রবণ করলে আমি কী আপনাকে বলতে চাই তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। হে মহামতি মহাজ্ঞানী ! আপনি সেই কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন।

জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীর গর্ভে এক সন্তানের জন্ম হয়েছিল। ব্রাহ্মণের গৃহে নিত্য শাস্ত্রাদি পাঠ হোত। একবার বর্ষাকালে চাতুর্মাস্য ব্রত উপলক্ষে ব্রাহ্মণের গৃহে বহু মুনিঋষিদের আগমন হয়েছিল। দাসীপুত্র সেই মহাত্মাদের সেবায় নিযুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। বালকের মধ্যে শিশুসুলভ চপলতা ছিল না। বালকের সংযতচিত্ত, ক্রীড়ায় অনাসক্তি, আজ্ঞাবহতা ও বাক্‌সংযম মহাত্মাদের প্রসন্ন করেছিল। সতত তাঁরা বালককে স্নেহের চোখে দেখতেন। তাঁরা বালকের উপর অনুগ্রহ করেছিলেন। বালকটি মুনি-ঋষিদের ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন প্রসাদ সহযোগে দিনে একবার মাত্র আহার করত। মহাপুরুষদের সেবা ও পূজা করে বালকের চিত্তশুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল আর তার ভজন ও পূজায় আগ্রহ জন্মেছিল। সেই মহাপুরুষগণ নিত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনোরম লীলা সংকীর্তন করতেন আর কর্ণ পথে তা  বালকের অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হোত। শ্রদ্ধাসহকারে তাঁদের প্রতিটি কথা শ্রবণ করে বালকের মনে অক্ষয়কীর্তি শ্রীভগবানের উপর অনুরাগ জন্মাল। অনুরাগ বালককে গোবিন্দনিষ্ঠচিত্ত করে তুলেছিল। বালক তার নিশ্চল বুদ্ধি দ্বারা সৎ ও অসৎ রূপে জগৎকে নিজ পরমহংসরূপ আত্মাতে মায়াকল্পিত ভগবৎশক্তির দ্বারা রচিত দেখতে লাগল। এইভাবে বর্ষা ও শরৎ এই চার মাস ধরে নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় মহাত্মা মুনিঋষিগণ শ্রীহরির নির্মল যশঃকীর্তন করলেন আর বালক তা ধারণ করে ধন্য হল। সেই দীনবৎসল মহাত্মাগণ বিদায়কালে কৃপা করে বালককে কিছু ভগবদুপদিষ্ট

গোপনীয় জ্ঞানোপদেশ দান করেছিলেন। তাতে বালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তি বৈভব জ্ঞান লাভ করে পরমপদ লাভ করেছিল।

অতঃপর মহাত্মাগণ ব্রত সমাপনে বিদায় নিলেন। বালকের মধ্যে তখন সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রবল। একমাত্র বাধা ছিল তার জননী, যিনি দাসীরূপে পরাধীন ছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণের গৃহেই সাময়িক বাস চলতে থাকল। একদিন সেই প্রিয় জননীও সর্পদংশনে অল্পক্ষণের মধ্যে সন্তানকে ছেড়ে চলে গেলেন। বালক তখন বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে ব্রাহ্মণ আবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। উত্তর দিকে চলতে চলতে সে বহুজনপদ, উদ্যান, গ্রাম, জলাশয়, বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এক গভীর অরণ্যে উপনীত হল। পথশ্রমে সে ক্লান্ত ও ক্ষুধা-তৃষ্ণাকাতর হয়ে পড়েছিল। এক নদীর তীরে বসে সে তৃষ্ণা নিবারণ ও স্নান করে খানিকটা সুস্থ হল। বালক তখন এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় বসে হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মাকে ধ্যান করতে লাগল। শ্রীভগবানের ধ্যান করতে করতে হরিভক্তিতে পরিপূর্ণ চিত্তে বালকের ভগবৎ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হল আর নয়ন যুগল প্লাবিত হল। শ্রীভগবান বালককে মানস চক্ষে দর্শন দিলেন।

প্রেমাতিশয্যে দেহে রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ হল আর চিত্ত শান্ত হয়ে গেল। তখন আর উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে কোনো প্রভেদ রইল না, বালক আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে গেল। হঠাৎ সেই সর্বশোকবিনাশন অভীষ্ট, শ্রীভগবানের সেই অনির্বচনীয় রূপে অদৃশ্য হয়ে গেল। বালক তখন বিহ্বল চিত্ত হয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তার মধ্যে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল কিন্তু মনকে হৃদয়কমলে বারে বারে সমাহিত করেও সে দর্শন লাভ করতে সক্ষম হল না। বালক অতৃপ্তিতে কাতর হয়ে পড়ল। তখন সেই নির্জন অরণ্যভূমিতে বাক্য ও মনের অতীত স্বয়ং শ্রীহরি গম্ভীর অথচ সুমধুর দৈববাণী করলেন—বৎস ! তুমি আর এই দেহে আমাকে দর্শন লাভ করতে পারবে না। হে অকল্মষ বালক ! আমাকে তোমার লাভ করবার ইচ্ছা প্রবল তাই তোমাকে একবার দর্শন দিয়েছি। অল্পকাল সাধুসঙ্গ লাভেই তোমার চিত্তবৃত্তি আমাতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এইবার তুমি যখন এই প্রাকৃত মলিন পাঞ্চভৌতিক শরীর ত্যাগ করবে তখন আমার

পার্ষদরূপে স্বীকৃতি পাবে। আমার ইচ্ছায় আমাতে নিবিষ্ট তোমার চিত্তবৃত্তি সতত একই থাকবে ; তোমার সাধক দেহের স্মৃতি অক্ষয় থাকবে।

বালক তারপর সেই শুভমুহূর্তের জন্য পৃথিবীর তীর্থসমূহে ভ্রমণ করতে লাগল। এইসময়ে তার দেহ নষ্ট হল। অতঃপর সেই বালকের মরীচি আদি ঋষিসহ দেবর্ষি নারদরূপে আগমন হল।

নিজ জীবনের ঘটনা বৃত্তান্ত বলে দেবর্ষি নারদ তখন বললেন—হে সত্য সংকল্প ব্যাসদেব ! পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সকল কর্ম সমর্পণ করে দেওয়ার মধ্যেই ভবসংসারের ত্রিতাপ জ্বালার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ নিহিত থাকে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম যদি শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভের জন্যই করা হয় তাহলে প্রকৃত পরাভক্তি জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। সেই ভগবৎ-নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানেরত মানুষ বারে বারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামগুণগান ; কীর্তন ও ধ্যান করতে থাকে। সে তখন ধ্যান করে :

**নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।**
**প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥**

(১।৫।৩৭)

হে প্রভু ! আপনি ভগবান শ্রীবাসুদেব আপনাকে প্রণাম। আমি আপনার ধ্যান করি। আমি প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণকেও প্রণাম করি।

এইভাবে যে চতুর্ব্যূহরূপ ভগবন্মূর্তির নাম দ্বারা প্রাকৃত মূর্তি বিরহিত অপ্রাকৃত মন্ত্রমূর্তি ভগবান যজ্ঞপুরুষকে পূজা করে তার জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান।

হে ব্যাসদেব ! আমি যখন শ্রীভগবানের আদেশ এইভাবে পালন করেছি, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আত্মজ্ঞান, ঐশ্বর্যজ্ঞান ও তাঁর ভাবরূপ প্রেমভক্তি প্রদান করেছেন।

তাই হে ব্যাসদেব ! হে পূর্ণজ্ঞানী ! আপনি শ্রীভগবানের লীলাসকল সবিস্তারে সংকীর্তনে ব্রতী হন।

এইকথা বলে দেবর্ষি নারদ স্থানান্তরে গমন করবার উদ্দেশ্যে আকাশ পথে রওনা হলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ রচনায় ব্রতী হলেন।

———o———

# ভক্ত প্রহ্লাদ

রাজা পরীক্ষিৎ মহাত্মা শুকদেবকে প্রশ্ন করেছেন — ঈশ্বর স্বভাবতই ভেদাভেদ বিরহিত ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন তাই তিনি স্বয়ং পরিপূর্ণ ও মূর্তিমান কল্যাণস্বরূপ। তাঁর দেবতাদের সঙ্গে কোনও রকম আদান-প্রদান বা স্বার্থের সম্পর্ক নেই। আবার নির্গুণ হওয়ায় দৈত্যদের সঙ্গে তাঁর কোনো শত্রুতাও নেই। শ্রীভগবানের মনে সমভাব সম্বন্ধে আমার মনে দ্বন্দ্ব আছে। কৃপা করে তা দূর করুন।

মহাত্মা শুকদেব বললেন—মহারাজ ! উত্তম প্রশ্ন। এই প্রশ্ন পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞকালে পিতামহ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকেও করেছিলেন। সেই কথোপকথন বিবরণ শ্রবণ করলেই উত্তর পাওয়া যাবে। অতঃপর সেই অমৃত কথা পরিবেশন করা হল।

ভক্ত ভক্তির দ্বারা যেমন শ্রীভগবানকে লাভ করে সেইভাবেই অনেকে কামনা, দ্বেষ, ভয় বা স্নেহের বশে নিজের মনকে শ্রীভগবানে নিবিষ্ট করেও সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁকেই লাভ করে থাকে।

**গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।**
**সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥**

(৭।১।৩০)

গোপীগণ তীব্র কামনা অর্থাৎ অনুরাগ দ্বারা, কংস ভয় দ্বারা, শিশুপাল, দন্তবক্ত্র, হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক্ষ, রাবণ-কুম্ভকর্ণ আদি ও অন্যান্য নৃপতিগণ বিদ্বেষ দ্বারা, যদুবংশীয় পারিবারিক সম্বন্ধ দ্বারা আর ভক্ত ভক্তি দ্বারা নিজ নিজ মন শ্রীভগবানে অর্পণ করেছিলেন।

এই বিদ্বেষ দ্বারা নিজের মন শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত রাখার মূলে ছিল ব্রাহ্মণের অভিশাপ। ভগবান ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার নামক ঋষিগণ একবার ত্রিলোকে স্বেচ্ছায় বিচরণ করতে করতে বৈকুণ্ঠে এসেছিলেন। তাঁরা দ্বারপাল জয়-বিজয়কে জানিয়েছিলেন যে,

তাঁরা বৈকুণ্ঠনাথের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। আপাতদৃষ্টিতে দিগ্‌বসন সাধারণ বালক মনে করে জয়-বিজয় তাঁদের শ্রীভগবানকে দর্শন করতে যেতে বাধা দেয়। ঋষিগণ কুপিত হয়ে দ্বারপালদের অভিশাপ দিলেন—মূর্খ ! ভগবান বিষ্ণুর চরণযুগল রজোগুণ ও তমোগুণ বিরহিত। তোমরা দুইজন তৎসমীপে বাস করবার যোগ্য নও। তাই অবিলম্বে তোমরা এইখান থেকে পাপময় অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করো।

অভিশাপ তৎক্ষণাৎ কার্যকর হয়েছিল। তখন ঋষিগণ কৃপা করে আবার বললেন—তিন জন্ম এই অভিশাপ ভোগ করে তোমরা আবার এই বৈকুণ্ঠেই ফিরে আসবে। এইভাবে তাঁদের কৃপা বিতরণও হয়েছিল।

ব্রাহ্মণভক্ত শ্রীহরি ব্রাহ্মণের অভিশাপকে সম্মান প্রদর্শন করে দ্বারপালদের অসুর যোনিতে জন্মগ্রহণে বাধা দিলেন না। অবশ্য তাঁর পরম ভক্ত যুগল জয়-বিজয়কে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে অবতার রূপে আসতে হয়েছিল। এই না হলে তিনি ভক্তবৎসল !

প্রথমে দিতির পুত্ররূপে তাদের জন্ম হয়েছিল। অগ্রজ হিরণ্যকশিপু ও অনুজ হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষকে উদ্ধার করবার জন্য শ্রীভগবানের বরাহ অবতাররূপে মর্তলোকে আসা। শ্রীহরি বরাহরূপ ধরে হিরণ্যাক্ষকে বধ করবার পর হিরণ্যকশিপু অনুজের মৃত্যু শোকে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। সে দৈত্যদানবদের সভায় ত্রিশূল উদ্যত করে প্রতিজ্ঞা করল—এ বিষ্ণু পূর্বে শুদ্ধচিত্ত ও নিরপেক্ষ ছিলেন। কিন্তু এখন আপন মায়াবলে বরাহাদি নানারূপ গ্রহণ করে চরিত্র ভ্রষ্ট হয়েছেন। আমি এই ত্রিশূল দ্বারা তাঁর শিরশ্ছেদ করে সেই রক্তে আমার অনুজের তর্পণ করব। হে দানব সকল তোমরা মর্ত্যে গমন করে যে যেখানে তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ব্রত, দানাদি শুভকর্ম করছে, তা পণ্ড করে তাদের হত্যা করো।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর আদেশ পালিত হল। উৎপাত বেড়ে গেল। নগর, গ্রাম, উদ্যান, শস্যক্ষেত্র, বিচরণভূমি, ঋষিদের আশ্রম, কৃষক-বসতি বাণিজ্যকেন্দ্র সব দগ্ধ হতে লাগল। হিরণ্যকশিপু মাতা, অনুজের ভার্যা ও সন্তানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলল— বিনাশশীল দেহের জন্য শোক করা উচিত

নয়। আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই।

হিরণ্যকশিপু নিজে অজেয়, অমর, ও একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ার বাসনায় মন্দার পর্বত কন্দরে উর্ধ্ববাহু হয়ে আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়ে কঠিন তপস্যা করতে শুরু করল। দীর্ঘদিন কঠোর তপস্যা করবার পর তার ব্রহ্ম-রন্ধ্র থেকে তপোময় সধূম্র অগ্নি নির্গত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সেই তেজে নদী ও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হল দ্বীপপুঞ্জ ও পর্বতমালাসহ পৃথিবী প্রকম্পিত হল, গ্রহ-তারাগণ স্থানচ্যুত হতে লাগল। হিরণ্যকশিপুর সেই তপোময় অগ্নির তাপ স্বর্গের দেবতাদেরও সন্তপ্ত করল। দেবতাগণ প্রতিবিধানের জন্য জগৎপতি ব্রহ্মার শরণাগত হলেন। ভগবান শ্রীব্রহ্মা তখন ভৃগু, দক্ষ আদি প্রজাপতিদের সঙ্গে নিয়ে হিরণ্যকশিপুর আশ্রমে গেলেন। বল্মীক, ঘাস ও বাঁশবনের মধ্যে হিরণ্যকশিপুকে দেখা যাচ্ছিল না। দেহ তপস্যাক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। ভগবান শ্রীব্রহ্মা বললেন—তোমার তপস্যা সিদ্ধ হয়েছে। এমন অদ্ভুত তপস্যা পূর্বে কোনো ঋষিও করেননি। হে দৈত্যশিরোমণি ! আমি প্রসন্ন। তুমি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা করো।

হিরণ্যকশিপু তখন শ্রীব্রহ্মার স্তুতি করে বর প্রার্থনা করল—আমাকে বর দিন যে আপনার সৃষ্ট কোনো প্রাণী মানুষ অথবা পশু, প্রাণী অথবা জড়, দেবতা অথবা দৈত্য-নাগ কারো হাতেই যেন আমার মৃত্যু না হয়। ভিতরে-বাইরে, দিনে-রাত্রে, আপনি সৃষ্ট করেননি এমন কোনো জীবের হাতে অস্ত্র অথবা শস্ত্র দ্বারা, পৃথিবী অথবা আকাশে কোথাও যেন আমার মৃত্যু না হয়। যুদ্ধে আমি যেন অজেয় হয়ে প্রাণীকুলের একচ্ছত্র অধিপতি হই। ইন্দ্রাদি লোকপালদের উপর আপনার মতন প্রভাব যেন আমারও থাকে ; তপস্বী ও যোগীর অক্ষয় ঐশ্বর্য ধারণ করি।

হিরণ্যকশিপুর মনোবাঞ্ছা ভগবান শ্রীব্রহ্মা বুঝতে পারলেন। কিন্তু কঠোর তপস্যার কথা স্মরণ করে সেই দুর্লভ বরই প্রদান করলেন। বরপ্রাপ্ত হয়ে হিরণ্যকশিপু শ্রীব্রহ্মার যথাবিহিত পূজা করলেন আর ব্রহ্মাও প্রজাপতিগণের সহিত স্বধামে গমন করলেন।

এবং লব্ধবরো দৈত্যো বিভ্রদ্ধেমময়ং বপুঃ।
ভগবত্যকরোদ্ দ্বেষং ভ্রাতুর্বধমনুস্মরন্॥

(৭।৪।৪)

শ্রীব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত হিরণ্যকশিপু সুবর্ণকান্তি সবল দেহ লাভ করল আর ভ্রাতার মৃত্যুকে স্মরণ করে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতি অতি ভয়ংকর বিদ্বেষভাব পোষণ করতে লাগল। অতঃপর সে ত্রিলোক ও দশ দিক অধিকার করে অত্যাচার করতে শুরু করল। সে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজপ্রাসাদও দখল করল। সকল লোকপালদের জয় করে হিরণ্যকশিপু একচ্ছত্র সম্রাটরূপে বাস করতে লাগল। সে দেব-দানব নির্বিশেষে সকলকে নিত্য তার চরণ বন্দনা করতে বাধ্য করল। নানা সুখ ভোগ করেও সে তৃপ্ত হোত না কারণ সে ইন্দ্রিয় পরিচালিত ছিল। তার কঠোর শাসনে লোকপালগণসহ সকলে ভীত ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। তারা তখন ভগবান শ্রীহরিকে স্মরণ করে পবিত্র চিত্তে আরাধনায় ব্রতী হল। তখন গুরুগম্ভীর আকাশবাণী হল—এই নীচ রাক্ষসের দুরাচারের বিষয় আমি জানি। যখন হিরণ্যকশিপু বৈরিতা বিরহিত, শান্ত, তার নিজ পুত্র মহাপ্রাণ প্রহ্লাদকে দ্বেষ করে অনিষ্ট করতে চাইবে তখন আমি তাকে বধ করব।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর চার পুত্র যার মধ্যে প্রহ্লাদ ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। সাধুদের প্রতি তাঁর সেবার মনোভাব ছিল। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণভক্ত, সৌম্যস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, সর্বভূতের প্রতি আত্মবৎ দৃষ্টিসম্পন্ন, সর্বজন প্রিয় ও জীবের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। দরিদ্রদের প্রতি তাঁর পিতাসম স্নেহ, সমবয়সীদের প্রতি ভ্রাতা সম প্রীতি ও গুরুজনদের প্রতি ভগবানসম ভক্তি ছিল। শ্রীহরির চরণে তাঁর জন্মগত স্বাভাবিক ভালোবাসা ছিল।

প্রহ্লাদ বাল্যকাল থেকেই শ্রীহরির ধ্যানে তন্ময় থাকতেন ; তখন তাঁর জাগতিক সুখ দুঃখের অনুভূতি থাকত না। শ্রীহরির বিরহে তিনি কখনো কখনো উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতেন। কখনো অন্তরে শ্রীভগবানকে নিবিড়ভাবে অনুভব করে আনন্দে হাসতে থাকতেন।

**ক্কচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শ নির্বৃতঃ।**
**অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥**

(৭।৪।৪১)

কখনো তিনি অন্তরে শ্রীভগবানের কোমল স্পর্শ অনুভব করে নির্বাক চিত্তে শান্তভাবে বসে থাকতেন। তখন তিনি অন্তরে রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ করতেন। তাঁর ভাবে বিভোর অর্ধ নিমীলিত নেত্রে সতত প্রেমাশ্রু টলটল করত। প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের পরম প্রেমিক ভক্ত, অতিশয় ভাগ্যবান ও উচ্চকোটির মহাত্মা ছিলেন।

শ্রীহরিভক্ত প্রহ্লাদকে পাপাচারী পিতা হিরণ্যকশিপু অপরাধীরূপে গণ্য করে তাঁর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করতে লাগল। দৈত্যকুলের পুরোহিত শ্রীশুক্রাচার্যের দুই পুত্র শণ্ড ও অমর্ক—প্রহ্লাদকে শিক্ষাদান করবার জন্য নিযুক্ত হলেন। তাঁরা বালক প্রহ্লাদ সহ অন্যান্য দৈত্যবালকদের রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।

একদিন হিরণ্যকশিপু বালক প্রহ্লাদকে কোলে বসিয়ে আদর করে জিজ্ঞাসা করল— সত্য করে বল। তোমার কোন বিষয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগে। প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন—

**তৎসাধু মন্যেঽসুরবর্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।**
**হিত্বাঽঽত্মপাতনং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥**

(৭।৫।৫)

হে পিতা! জীব ভ্রান্ত আত্মভেদবুদ্ধির অভিমানে উন্মত্ত হয়ে সতত উদ্বিগ্ন চিত্তে সময় কাটায়। অধঃপতনের মূল কারণ অন্ধকূপসম সংসারে বাস করা অপেক্ষা নির্জন অরণ্যে বাস করে শ্রীহরির চরণ সেবাকেই আমি শ্রেয় জ্ঞান করি।

পুত্র প্রহ্লাদের মুখ থেকে শত্রুর প্রশংসা শুনে হিরণ্যকশিপু বিকট হাস্য সহকারে বলল— শিক্ষকদের দোষেই প্রহ্লাদের এমন বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটেছে। তার ধারণা হল যে আচার্যের আশ্রমে কিছু হরিভক্ত ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশে বাস করছে। বালককে চোখে চোখে রাখা প্রয়োজন যাতে তার বুদ্ধিকে ভুলপথে কেউ চালিত না করতে পারে। এইবার তার অনুচরেরা সাবধানে আচার্যর

আশ্রমে তাঁকে পৌঁছে দিল। আচার্যদের জন্য যথাযোগ্য আদেশ প্রেরিত হল।

শণ্ড ও অমর্ক তখন প্রহ্লাদকে বুঝিয়ে বললেন—আমরা তোমার গুরু ; আমরা তোমাকে যে সব শিক্ষা দিয়েছি তা তোমার পিতাকে না বলে এমন বিপরীত বুদ্ধির উত্তর কেন দিলে ? এই শিক্ষাদান তোমাকে কে করেছে ? প্রহ্লাদ উত্তর দিলেন —জাগতিক মোহে যাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত, শ্রীহরির মায়াতেই তাদের মধ্যে 'আমি-আমার' সম ভেদবুদ্ধির উদয় হয়। সেই মায়াধীশ শ্রীহরিকে আমি প্রণাম করি।

**যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।**
**তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া॥**

(৭।৫।১৪)

চুম্বক তার স্বভাবেই লৌহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। তেমন ভাবেই চক্রপাণি শ্রীহরির ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে আমার চিত্তও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর দিকে আকর্ষণ অনুভব করছে।

প্রহ্লাদের মতিগতি আচার্যদ্বয়কে ভাবিয়ে তুলল। তাঁরা প্রহ্লাদকে তিরস্কারাদি করলেন, ভয় দেখালেন আর ধর্ম, অর্থ ও কাম সম্বন্ধে শিক্ষা দান করতে লাগলেন। সাম, দান, দণ্ড, ভেদ বিষয়ে উত্তম শিক্ষাদান করে সন্তুষ্ট হয়ে আচার্যদ্বয় প্রহ্লাদকে তার মাতার কাছে টেনে নিয়ে গেলেন। মাতা স্নান ও বস্ত্রালংকার ধারণ করিয়ে দিলে প্রহ্লাদকে পিতা হিরণ্যকশিপুর কাছে প্রেরণ করা হল। আচার্যগণ দৈত্যরাজের কাছ থেকে উত্তম পুরস্কার লাভ করবার আশা করেছিলেন।

প্রহ্লাদ পিতাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করাতে হিরণ্যকশিপু তাঁকে কোলে তুলে বহুক্ষণ ধরে আলিঙ্গন করল। দৈত্যরাজের অন্তর তখন আনন্দে ভরপুর ছিল। অতঃপর হিরণ্যকশিপু বলল —চিরজীবী প্রহ্লাদ ! আচার্যদের কাছে যে শিক্ষালাভ করেছ তার থেকে কোনো উত্তম প্রসঙ্গ আমাকে শোনাও। প্রহ্লাদ বললেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

(৭।৫।২৩)

শ্রীবিষ্ণুর নাম-রূপ-গুণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ, নাম সংকীর্তন, শ্রীবিষ্ণুর লীলাস্মরণ, মনে মনে তাঁর শ্রীপাদপদ্মসেবা, তাঁর পূজা, স্তোত্র পাঠ, দাস্যভাবে কর্ম সমর্পণ সখ্যভাবে প্রীতি স্থাপন ও তাঁতে শরণাগতি – ভগবানের প্রতি সমর্পণভাবে এই নয় লক্ষণযুক্ত যে বিদ্যার দ্বারা অর্জিত হয়, আমি তাকেই যথার্থ শিক্ষা মনে করি।

ভক্ত প্রহ্লাদ কথিত ভক্তিকে নবধা ভক্তি আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এর যে কোনো একটি পথে ভক্ত এগিয়ে গেলেই যে শ্রীহরিকে লাভ করতে সক্ষম হয়। যা শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ মুক্তি লাভ করেছিলেন আর মহাত্মা শুকদেব তা সংকীর্তন করে শ্রীহরির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীহরিকে স্মরণ করে উদ্ধার পাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা তো অগুনতি ; ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব, বিভীষণ। আমরা জানি যে দেবী লক্ষ্মী সতত শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম সেবা করে থাকেন। অর্চনা করে শ্রীহরিকে লাভ করা আমরা মহারাজ পৃথুর মধ্যে দেখি। অক্রূরকে দেখি শ্রীহরির বন্দনা করে উদ্ধার পেতে। শ্রীহনুমান শ্রীহরিকে দাস্য ভাবে সেবা করেছিলেন আর অর্জুন সখ্যভাবে। আর শ্রীহরির শরণাগত হয়ে মুক্তিলাভ করা ব্যক্তিদের সংখ্যাই সর্বাধিক ; এই প্রসঙ্গে মহারাজ বলির কথাই প্রথম মনে পড়ে। অবশ্যই উদ্ধব, শবরীর কথাও ভুলে গেলে চলবে না।

এই নবধা ভক্তির প্রসঙ্গে একটা কথা বলা হয়ত প্রয়োজন। ভক্ত প্রহ্লাদ নবধা ভক্তির প্রথম পথ রূপে শ্রবণ করাকে সর্বাগ্রে বলেছেন। জ্ঞানমার্গেও সর্বপ্রথমে শ্রবণের কথা বলা হয়েছে। শ্রীহরির কথা শ্রবণ করলে তবেই তো অন্য পথসমূহের দ্বার উন্মোচন হয়। তাই ভক্ত যেন প্রথমে শ্রবণ করে তবেই নাম-সংকীর্তনে অগ্রসর হয় কারণ নাম-রূপ-গুণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে আর তা ভালো লাগলে তবেই তো নাম-সংকীর্তনের ফল পাওয়া সম্ভব। অবশ্য ভক্তকে সতত মনে রাখতে হবে যে শরণাগতবৎসল শ্রীহরির শরণাগত হলেই সর্বসিদ্ধি নিশ্চিত।

এই নবধা ভক্তির স্মরণের মধ্যেও একটা কথা প্রাসঙ্গিক যে, স্মরণ তো ভালোবেসে অথবা বিদ্বেষভাবেও করা সম্ভব। বিদ্বেষ করে স্মরণ করাও যে একটা ভক্তির পথ তা ভাবতে অবাক লাগে। তবে তা যে সঠিক তা আমরা

দেখি হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপু, রাবণ-কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল-দন্তবক্ত্র প্রসঙ্গে। সকলেই যে মৃত্যুর পর শ্রীহরির অঙ্গে জ্যোতিরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছিল তা আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। তা কিন্তু বাস্তবে ঘটেছিল কারণ কেউ শ্রীহরির সঙ্গে নিত্যযুক্ত আর তার উদ্ধার হল না তা সম্ভব নয়।

পুত্র প্রহ্লাদের কথা যে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ভালো মনে করবে না তা অনুমান করা শক্ত নয়। দৈত্যরাজ তখন প্রহ্লাদের আচার্যদের কটু কথা বলতে লাগল। আচার্য উত্তর দিলেন—হে রাজন্! এ ওর স্বাভাবিক জন্মজাত বুদ্ধি। ওই শিক্ষা প্রহ্লাদ কখনই আমাদের কাছে পায়নি। দৈত্যরাজ তখন প্রহ্লাদের কাছেই প্রশ্ন রাখল—গুরু যদি এই সব কথা শিক্ষা না দিয়ে থাকেন তাহলে এই অনিষ্টকর কথাগুলি কোথা থেকে পেলি ? প্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে বললেন :

**মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।**
**অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্॥**

(৭।৫।৩০)

ইন্দ্রিয়সংযম বিহীন জীবের বিষয়ের উপর আসক্তিই তাকে সংসাররূপ ঘোর নরক অভিমুখে টেনে নিয়ে যায়। তখন অপরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে শ্রীহরির উপর আকর্ষণ অনুভব করে না।

**নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।**
**মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥**

(৭।৫।৩২)

শ্রীহরির পাদপদ্মের কৃপা লাভ করবার জন্য বিষয়াসক্তি বিরহিত ভগবৎপ্রেমী মহাপুরুষদের কৃপা প্রয়োজন হয় ; কেবল বৈধী কর্মে তা লাভ করা যায় না।

পুত্র প্রহ্লাদের কথা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে কুপিত করল। সে পুত্রকে কোল থেকে ফেলে দিয়ে তাঁকে বধ করবার জন্য অনুচরদের আদেশ দিল। হিরণ্যকশিপুর চোখে তখন প্রহ্লাদ ভ্রাতার হত্যাকারী শ্রীবিষ্ণুর সেবক মাত্র। সে দেখতে চাইল যে বালকের ইষ্ট শ্রীহরি কেমন করে তাঁকে রক্ষা করেন। আর সন্দেহ হল যে ভগবান শ্রীবিষ্ণুই তার পুত্ররূপে তার গৃহে অবতরণ

করেছেন। হিরণ্যকশিপু ঠিক করে ফেলেছিল যে দুষ্ট শত্রুকে বিনাশ করে ফেলাই ঠিক হবে। সে বিষ প্রয়োগ, শূল প্রহার, খড়্গাঘাত করে কিছুতেই শ্রীহরির আশ্রিত ভক্ত প্রহ্লাদকে বশীভূত করতে পারল না। তাই আচার্যদ্বয় শণ্ড ও অমর্কের পরামর্শে স্থির হল যে গুরু শুক্রাচার্যের আগমন কাল পর্যন্ত প্রহ্লাদকে বেঁধে রাখা হোক। ভক্ত প্রহ্লাদকে বধ করবার জন্য বহু অন্য উপায়ও সফল হয়নি। মত্তহস্তীর পদতলে নিক্ষেপ, বিষধরগণের দংশন, কৃত্যা রাক্ষসীর দ্বারা দগ্ধ করা, পর্বত শিখর থেকে নিক্ষেপ, তুষারাবৃত স্থানে ফেলে দেওয়া, অগ্নির লেলিহান শিখায় ও উত্তাল সমুদ্রে নিক্ষেপ— সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছিল।

এরই মধ্যে প্রহ্লাদের আচার্যদ্বয় তাঁকে গৃহস্থ নৃপতির পালনীয় ধর্ম, অর্থ, কাম শিক্ষা দান করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। আশ্রমে অতিশয় বাধ্য সেবকের মতন প্রহ্লাদ দিন কাটাতে লাগলেন। একদিন আচার্যগণের অসাক্ষাতে ভক্ত প্রহ্লাদ সমবয়স্ক বালকদের খেলা করবার ছলনায় ডেকে ভগবৎকথা বলতে লাগলেন। ভক্তপ্রহ্লাদ তাদের বললেন — তোমরা বিষয়াসক্ত দৈত্যদের সঙ্গ ত্যাগ করে আদিদেবতা শ্রীহরির শরণাগত হও। তিনি মহাপুরুষদের প্রিয়তম ও পরমগতি।

ভক্ত প্রহ্লাদের মতিগতির কথা আবার গুরুদের মাধ্যমে দৈত্যরাজের কাছে পৌঁছাল। হিরণ্যকশিপু স্থির করে ফেলল যে প্রহ্লাদকে নিজের হতেই বধ করে তার আদেশ লঙ্ঘন করবার শাস্তি দেবে। সে সক্রোধে পুত্র প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করল—মূর্খ ! কোন সাহসে তুই আমার আদেশ লঙ্ঘন করিস ?

ভক্ত প্রহ্লাদ বললেন— হে দৈত্যরাজ ! ব্রহ্মাদি দেবগণ, স্থাবর-জঙ্গম জগতে যা কিছু বিদ্যমান সবই শ্রীহরির বশীভূত। তিনি অমিত পরাক্রমী, মহাকাল প্রাণীর ইন্দ্রিয় বল, মনোবল, দেহবল, ধৈর্য ও ইন্দ্রিয়সমূহ সবই তিনি। তিনি সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বর যিনি নিজ ক্ষমতা বলে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করে থাকেন। তিনি ত্রিগুণের প্রভু। অতএব আপনি আপনার এই অসুরভাব ত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হন।

হিরণ্যকশিপু বলল—ওরে নির্বোধ ! মৃত্যু তোর শিয়রে দণ্ডায়মান। তাই এত বড় বড় কথা বলছিস। আমিই তো জগৎপতি। তোর জগৎপতিকে দেখা

তাহলে। তুই বলছিস তোর জগৎপতি সর্বত্র বিদ্যমান। তাহলে তাকে এই স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে না কেন ?

**এবং দুরুক্তৈর্মুহুরর্দয়ন্রুষা সুতং মহাভাগবতং মহাসুরঃ।**
**খড়্গং প্রগৃহ্যোৎ পতিতো বরাসনাৎ স্তম্ভং তাতাড়াবিলঃস্বমুষ্টিনা॥**
(৭।৮।১৫)

এইভাবে সেই অতি দুরন্ত মহাদৈত্য ভগবানের পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে শাসাতে লাগল। এরপর সে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খড়্গহস্তে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে নামল আর সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই স্তম্ভে মুষ্ট্যাঘাত করল।

মুষ্ট্যাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্তম্ভের ভিতর থেকে ব্রহ্মাণ্ড বিদারণকারী এক ভয়ংকর শব্দ উত্থিত হল। হিরণ্যকশিপু তখন সেই নাদের উৎস খুঁজতে লাগল, কিন্তু সে কিছুই দেখতে পেল না।

**সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিত ব্যাপ্তিং চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।**
**অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্ স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষম্॥**
(৭।৮।১৮)

আপন ভক্ত প্রহ্লাদ ও ব্রহ্মার বরদানকে সত্য (প্রমাণ করবার জন্য) ও শ্রীহরি সর্বত্র বিরাজমান—প্রমাণ করবার জন্য সভার মধ্যেই সেই স্তম্ভ থেকে বিচিত্ররূপ ধারণ করে শ্রীহরি আবির্ভূত হলেন। তা সিংহ ও মানুষের সম্মিলিত এক বিচিত্র রূপ ছিল।

অলৌকিক নৃসিংহরূপে শ্রীভগবান এইবার হিরণ্যকশিপু সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। অতি ভয়ংকর ছিল সেই দৃশ্য। উত্তপ্ত সুবর্ণসম পীত নয়নযুগল দেদীপ্যমান ছিল। মুখব্যাদানে কেশর সমূহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। করাল দন্তপঙ্‌ক্তি, তরবারিসম চঞ্চল ও ক্ষুরের মতন শাণিত জিহ্বা, ভয়াল ভঙ্গি, ভ্রূকুটি, নিশ্চল ঊর্ধ্বোত্থিত কর্ণ, গভীর গিরিকন্দরসম বিস্ময় ও ত্রাসকারী ব্যথিত মুখগহ্বর ও প্রস্ফুটিত নাসারন্ধ্র, বিস্ফারিত হনু যুক্ত সেই নৃসিংহদেবের মুখ ভীষণদর্শন ছিল। তাঁর বিশাল দেহ আকাশস্পর্শ করছিল, গ্রীবা কিঞ্চিৎ খর্ব ও পৃথুল ছিল। বিশাল তাঁর বক্ষঃস্থল ও কৃশ কটিদেশ। সর্বশরীর আবৃত করে চন্দ্রকিরণের মতন শুভ্র রোমরাজি শোভা পাচ্ছিল, চতুর্দিকে বিস্তৃত শত শত বাহুতে তীক্ষ্ণ নখরূপ অস্ত্র বিরাজমান ছিল।

হিরণ্যকশিপুর এই রূপকে শ্রীহরির মায়াবী রূপ মনে করে সে গদা হস্তে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গরুড় যেমন মহাসর্পকে অনায়াসে ধরে ফেলে তেমনভাবেই শ্রীনৃসিংহদেব গদাসহ সেই বিক্রম প্রদর্শনকারী দৈত্যকে ধরে ফেললেন। আর তাকে রাজসভার দ্বার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে নিজের জঙ্ঘার উপর শায়িত করলেন আর গরুড় যেমন ভাবে বিষধর সর্পকে চিরে ফালাফালা করে ফেলে তেমন ভাবে তিনিও নখ দিয়ে তাকে অনায়াসে ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন।

**সংরম্ভদুষ্প্রেক্ষ্যকরাললোচনো ব্যাত্তাননান্তং বিনিহন্‌স্বজিহ্বয়া।**
**অসৃগলবাক্তারুণকেসরাননো যথান্ত্রমালী দ্বিহত্যয়া হরিঃ॥**
(৭।৮।৩০)

দৈত্যবধ কালে নৃসিংহদেবের ক্রুদ্ধ করাল চক্ষুর দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। তিনি অতিশয় ভয়ংকর রূপে ব্যাদিত মুখকে জিহ্বা দ্বারা লেহন করছিলেন। রুধির স্পর্শে তখন তাঁর মুখমণ্ডল ও কেশর অরুণাভ হয়ে উঠেছিল। করীশাসনকারী সিংহসম তিনি হিরণ্যকশিপুর নাড়িভুঁড়ি মালারূপে গলায় ধারণ করলেন।

তিনি তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা হিরণ্যকশিপুর হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়ে তা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তখন হিরণ্যকশিপুর অনুচরগণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শ্রীভগবানের উপর আঘাত করতে উদ্যত হল। শ্রীভগবান সহজেই তাদের পরাভূত করলেন। তারা পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করল।

ভগবান নৃসিংহদেবকে বাধা দেওয়ার জন্য আর কেউ রইল না। তাঁর ক্রোধ কিন্তু প্রশমিত হচ্ছিল না। তিনি হিরণ্যকশিপুর সভার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। এই অবস্থায় ভয়ংকর দর্শন নৃসিংহদেবের কাছে কেউই এগিয়ে যেতে সাহস পাচ্ছিল না। তাঁর এই নৃসিংহমূর্তি ধারণ ভগবান ব্রহ্মার প্রদত্ত বরকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য হয়েছিল। হিরণ্যকশিপুকে তাই দ্বারদেশে, দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণে, জঙ্ঘার উপর রেখে, নখ দ্বারা বধ করা হয়েছিল।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে হিরণ্যকশিপুর নাড়িভুঁড়ি মালার মতন করে গলায় পরবার কী দরকার ছিল ? আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে

হিরণ্যকশিপু আসলে হল বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল 'জয়' যাকে উদ্ধার করবার জন্য শ্রীভগবানের অবতরণ, যে আবার প্রহ্লাদসম উত্তম ভক্তের জন্মদাতা। তাই বধ করেও তার নাড়িভুঁড়ি মালা করে ধারণ করে তাঁর ভক্তকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

দৈত্যরাজ নিহত হতেই দেবতাদের মধ্যে ছুটোছুটি পড়ে গেল। তাঁরা পুষ্পবৃষ্টি করে আনন্দ প্রকাশ করলেন। বাদ্য বেজে উঠল আর অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগল। ভগবান নৃসিংহদেব কিন্তু তখনও রুদ্রমূর্তিতে বিরাজমান। দেবতাদের স্তুতিতেও তিনি তখন শান্ত হলেন না। সকলে পরামর্শ করে লক্ষ্মীদেবীকে রাজি করালেন এই কার্যের জন্য। সেই ভয়ংকর নৃসিংহ ভগবানকে দেখে লক্ষ্মীদেবীও রণে ভঙ্গ দিলেন। শ্রীহরি ভক্তকে রক্ষা করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন তাই সকলে ভক্ত প্রহ্লাদকে এই কার্যের জন্য অনুরোধ করলেন। সকলের অনুরোধ শিরোধার্য করে ভক্ত প্রহ্লাদ ভগবান নৃসিংহদেবকে শান্ত করতে এগিয়ে গেলেন। ভক্ত প্রহ্লাদ শ্রীহরিকে দর্শন করে তাঁর নিকটে গমন করে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করলেন।

**স্বপাদমূলে পতিতং তমর্ভকং বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ।**
**উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং কালাহিবিত্রস্তধিয়াং কৃতাভয়ম্॥**

(৭।৯।৫)

ভক্ত প্রহ্লাদ তাঁর চরণতলে পড়ে আছেন দেখে ভগবান নৃসিংহদেবের হৃদয় করুণায় আপ্লুত হল। তিনি সস্নেহে প্রহ্লাদকে তুললেন আর মস্তকে বরদহস্ত স্থাপন করলেন।

কালসর্পভয়গ্রস্ত ব্যক্তিকে যে অভয় হস্ত নিশ্চিন্ত করে সেই হস্তের স্পর্শ লাভ করেই প্রহ্লাদের সকল অশুভ ও অমঙ্গল দূর হল আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হল। প্রহ্লাদের অন্তরে তখন পরম আনন্দ আর অঙ্গে রোমাঞ্চ অনুভূতি। প্রহ্লাদ পরম প্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে সজল নয়নে ভগবান নৃসিংহদেবের শ্রীপাদপদ্ম নিজ অন্তরে ধারণ করলেন। প্রহ্লাদ তখন শ্রীভগবানে মন নিমগ্ন করে শ্রীহরির স্তব করতে লাগলেন—

আপনি তো দেবতা, মুনিঋষি ও সিদ্ধ তাপসদের স্তুতিতেও তুষ্ট হননি, আমি তো অধমকুলজাত তমোগুণসম্পন্নমাত্র। আমি কেমন করে আপনাকে তুষ্ট করব ? শ্রীহরি ভক্তিতেই তুষ্ট হন। ভগবৎ বিমুখ ব্রাহ্মণ সকল

গুণসম্পন্ন হলেও যে চণ্ডাল কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিতে নিত্যযুক্ত হয়েছে সে ব্রাহ্মণ থেকেও বড়।

**তস্মাদহং বিগত বিক্লব ঈশ্বরস্য সর্বাত্মনা মহি গৃণামি যথামনীষম্।**
**নীচোঽজয়া গুণবিসর্গমনু প্রবিষ্টঃ পূয়েত যেন হি পুমাননুবর্ণিতেন॥**

(৭।৯।১২)

তাই সর্বতোভাবে অযোগ্য ও অনধিকারী হয়েও আমি এখন শ্রীহরির মহিমা সংকীর্তন করছি। এই মহিমা সংকীর্তনের এমনই শক্তি যে অবিদ্যার বশীভূত হয়ে গতায়াতচক্রে পতিত জীবনও তা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়।

যে অসুরকে বধ করবার জন্য আপনি কুপিত হয়েছিলেন সে তো বধ হয়েই গিয়েছে। আপনি কৃপা করে ক্রোধ সংবরণ করুন। আপনার শান্ত আনন্দময় রূপ দর্শন করবার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। ভয় থেকে মুক্তি লাভ করবার জন্য মানুষ যুগে যুগে আপনার নৃসিংহদেব মূর্তি স্মরণ করবে।

আপনার ভয়ংকর রূপ দেখে আমি একটুও ভয় পাইনি। আমি কেবল এই দুঃসহ উগ্র কায়াত চক্রকেই ভয় পাই। আমার একান্ত কামনা যে আপনি প্রসন্ন হয়ে সকল জীবের পরম আশ্রয় ও মোক্ষস্বরূপ আপনার ওই শ্রীপাদপদ্মে আমাকে স্থান দিন।

হে প্রভু ! আপনিই আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু। আপনি তো সকলেরই পরম আরাধ্য।

**সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া লীলাকথাস্তব নিসৃংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।**
**অজ্ঞস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো দুর্গাণি তে পদযুগালয়হংসসঙ্গঃ॥**

(৭।৯।১৮)

হে নৃসিংহদেব ! আপনার চরণাশ্রিত জ্ঞানী ভক্তদের সাধুসঙ্গ লাভ করে আমি প্রাকৃত গুণসকল থেকে মুক্তি লাভ করে প্রিয় বন্ধু ও পরমাত্মাস্বরূপ আপনার মহিমাযুক্ত লীলা সংকীর্তন করে দুর্গম পথ অতিক্রম করে যাব।

হে ভগবন্ ! জগতে সকলেই স্বর্গলাভের জন্য লালায়িত থাকে। স্বর্গ লাভ করা সকল লোকপালের সেই আয়ু, ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য আমার দেখা

হয়ে গিয়েছে। পিতার ভ্রূকুটিতে স্বর্গসুখ ভুলে সকলেই তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ত। আপনি আমার সেই পিতাকে তো বধ করেছেন। তাই ব্রহ্মলোকের আয়ু, ধনসম্পদ, ঐশ্বর্য ও ইন্দ্রিয়ভোগে আমার আসক্তি নেই ; আপনি শক্তিশালী কলিরূপ ধারণ করে সকলই গ্রাস করে রেখেছেন। তাই আমাকে সেবকরূপে আপনার চরণেই আশ্রয় দিন।

হে প্রভু ! আমার চঞ্চল মন সতত ইন্দ্রিয়াদির পথে বিভিন্ন ভোগের দিকে ধাবিত হয়। বস্তুত গতায়াতচক্রে আবর্তনকারী জীবের আমার মতনই অবস্থা। আপনি যদি সকলকে উদ্ধার করতে রাজি না হন, তাহলে না হয় মূঢ়দের আপনি উদ্ধার করুন।

**নৈবোদ্বিজে পর দুরত্যয়বৈতরণ্যাস্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।**
**শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থমায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢ়ান্॥**

(৭।৯।৪৩)

হে পরমাত্মস্বরূপ ! ভববৈতরণী পার হওয়ার জন্য আমি উদ্বিগ্ন আদৌ নই কারণ আমার মন বৈতরণীতে নয় সেই অমৃতসম আপনার লীলা সংকীর্তনেই মগ্ন থাকে। কিন্তু যারা বৃথা ইন্দ্রিয় সুখের আশায় সংসারের ভার বহন করে অথচ আপনাতে বিমুখ হয়ে আপনার নাম সংকীর্তন করে না আমার চিন্তা হয় সেই মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্যই।

হে প্রভু ! স্বনামধন্য মুনিঋষিরা নিজের মুক্তির জন্য অরণ্যবাসী হয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করেন। অন্য কারও মুক্তির সম্বন্ধে তাঁরা উদাসীনই থাকেন। আমি কিন্তু এই অবোধ অসহায় দীনহীনদের পরিত্যাগ করে একা মুক্ত হতে চাই না আর এই বিপথগামী জীবদের উদ্ধার করবার জন্য আপনি ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই।

হে অনন্ত ! হে প্রভু ! বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, পঞ্চভূত, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, চিত্ত, অহংকার, সম্পূর্ণ জগৎ, সগুণ ও নির্গুণ— সব কিছু আপনিই। এমন কী মন ও শব্দের দ্বারা নিরূপিত বস্তুসকল সবই আপনি ছাড়া আর কিছু নয়।

**তৎ তেঽর্হত্তম নমঃস্তুতি কর্মপূজাঃ কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্।**
**সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত॥**

(৭।৯।৫০)

হে পরমপূজ্যপাদ ! প্রণাম, লীলা সংকীর্তন, সর্বকর্ম সমর্পণ, পরিচর্যা, স্মরণ-মনন ও নাম সংকীর্তন শ্রবণ—এই ষড়বিধ ভগবৎ-সেবা ছাড়া পরম হংসদের লাভ করা ভক্তি সাধারণ মানুষ কেমন করে লাভ করবে ? হে প্রভু ! আপনি তো আপনার ভক্তদেরই।

এইভাবে স্তুতি করে ভক্ত প্রহ্লাদ শ্রীভগবানের শ্রীচরণে নতমস্তক হয়ে চুপ করে গেলেন। শ্রীভগবানের ক্রোধ তখন শান্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি প্রীতিতে পূর্ণ হয়ে বললেন :

**প্রহ্লাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতিঽহং তেঽসুরোত্তম।**
**বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম॥**

(৭।৯।৫২)

হে অসুরশ্রেষ্ঠ সৌম্য প্রহ্লাদ ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন। তোমার কল্যাণ হোক। তুমি আমার কাছে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা করো। আমাকে সকলে প্রাণীকুলের অভিলাষপূরণকারী রূপেই জানবে।

যে আমাকে প্রসন্ন করতে পারে না, আমার দর্শন লাভ করা তার পক্ষে কঠিন আর আমার দর্শন লাভ করলে জীব কখনো শোক অথবা মোহে অভিভূত হয় না।

বর প্রার্থনা করবার অভিলাষ ভক্ত প্রহ্লাদের আদৌ ছিল না। তাই তিনি বললেন :

**মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাঽঽসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।**
**তৎসঙ্গভীতো নির্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥**

(৭।১০।২)

হে প্রভু ! আজন্ম আমি বিষয়ভোগাসক্ত, সুতরাং আমাকে বরদানের দ্বারা প্রলোভিত করবেন না। বিষয়ভোগাসক্তিতে ভীত হয়ে, সেগুলির ভোগে সন্তপ্ত হয়ে তার থেকে মুক্তি লাভ করবার জন্য আপনার শরণাগত হয়েছি।

আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত আর আপনি আমার নিরপেক্ষ প্রভু ; প্রয়োজনবশত রাজার-প্রজার সঙ্গে যে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক থাকে তেমন আদৌ নয়। আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনও হেতুবশতঃ নয়।

হে কমললোচন ! যখন মানুষ তার মনের সমস্ত কামনা পরিহার করে, তখনই সে ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

**নমো ভগববতে তুভ্য পুরুষায় মহাত্মানে।**
**হবয়েঽদ্ভুতসিংহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে॥**

(৭।১০।১০)

হে ভগবন্ ! আপনাকে প্রণাম। আপনি সকলের অন্তরেই বিরাজমান থাকেন। আপনি উদার শিরোমণি, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। এই অপূর্ব নৃসিংহ রূপধারী শ্রীহরির চরণে আমি বারে বারে প্রণাম নিবেদন করি।

এইবার ভগবান নৃসিংহদেব বললেন—হে প্রহ্লাদ ! তোমার মতন ভক্ত তো ভোগবিলাস প্রার্থনা করে না। তুমি এক মন্বন্তর কাল পর্যন্ত ইহলোকে দৈত্যাধিপতিদের ঐশ্বর্য ভোগ করো। তুমি অন্তরে আমাকে দেখতে পাবে, আমার লীলাকথা শুনতেও পাবে ; সকল কর্ম দ্বারা আমাকে আরাধনা করে প্রারব্ধ কর্মের নাশ করো। তুমি ভোগের দ্বারা পুণ্যকর্মের ফল ও নিষ্কাম পুণ্যকর্মের দ্বারা পাপ ক্ষয় করে সমস্ত বন্ধনং থেকে মুক্ত হয়ে সময়মতন দেহ ত্যাগ করে আমার কাছে চলে আসবে। স্বর্গেও তোমার অক্ষয় কীর্তির সংকীর্তন হবে। তোমার কত স্তুতি ও বন্দনা করে মর্ত্যধামের ব্যক্তিগণ যারা তোমাকে ও আমাকে স্মরণ করবে তারা এই ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবে।

এইবার ভক্ত প্রহ্লাদ বললেন—হে মহেশ্বর ! হে বরদাতা ! আমি তাই একটা বর চাইছি। আমার পিতৃদেব আপনার শক্তিমান অলৌকিক তেজের কথা না জেনে আপনার বিরোধিতা করেছেন। হে দীনবন্ধু ! আপনার দৃষ্টিপাতেই তিনি পবিত্র হয়েছেন। আমার পিতার অপরাধের সীমা নেই তবু আমি প্রার্থনা করি তিনি যেন আপনাকে নিন্দা করার ভয়ানক পাপকর্ম থেকে মুক্ত হন।

শ্রীনৃসিংহদেব বললেন—হে অকল্মষ প্রহ্লাদ ! তোমার পিতা আপনা

থেকেই পবিত্র হয়ে মুক্ত হয়েছেন। এমন কী তোমার মতন কুলপবিত্রকারী পুত্র লাভ করে পূর্বাপর একুশ পুরুষসহ তিনি মুক্তির অধিকারী।

এই জগতে যারা তোমাকে অনুকরণ করবে তারাও আমার ভক্তে পরিণত হবে। হে বৎস ! তুমিই আমার ভক্তকুলের আদর্শ হবে। যদিও তোমার পিতা আমার স্পর্শ লাভ করে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হয়েছেন তবুও তুমি তাঁর অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করো। তোমার মতন পুত্র লাভের জন্যই উনি পরমলোক প্রাপ্ত হবেন। অতঃপর হে বৎস ! তুমি তোমার পিতার শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে, বেদবিধি অনুসারে আমার শরণাগত থেকে আমার স্মরণ মননে নিত্যযুক্ত থেকে সেবাবুদ্ধিযুক্ত হয়ে আপন কার্যে প্রবৃত্ত হও।

শ্রীভগবানের আদেশ অনুসারে প্রহ্লাদ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দ্বারা রাজ্যাভিষিক্ত হলেন। তখন দেবতা ও মুনিঋষিদের সঙ্গে ভগবান শ্রীব্রহ্মা নৃসিংহ ভগবানের প্রসন্নবদন অবলোকন করে তাঁর স্তুতি করতে লাগলেন—হে ভগবন্ ! একাগ্রচিত্তে যে আপনার নৃসিংহ রূপের ধ্যান করবে সে সকল ভয় এমনকী মৃত্যুও অতিক্রম করবে।

ভগবান শ্রীব্রহ্মার অর্চনা স্বীকার করে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব অন্তর্ধান করলেন। ভক্তবৎসল নৃসিংহ ভগবানের জয় হোক।

———o———

# বামনাবতার

সমাধি মগ্ন মহর্ষি কশ্যপ তখনও জানতেন না যে দেবতাগণ অমরাবতী থেকে অমিতবিক্রম দৈত্যরাজ বলি দ্বারা বিতাড়িত হয়েছেন। সমাধি ভঙ্গে তিনি দেবমাতা অদিতিকে বিষণ্ণ চিত্ত দেখে, তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জানলেন যে দৈত্যরাজ বলি বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করে অতিশয় শক্তিধর হয়ে উঠেছেন। দৈত্যরাজ যজ্ঞাগ্নি থেকে সুবর্ণমণ্ডিত রথ, হরিদ্বর্ণ অশ্ব ; সিংহচিহ্নযুক্ত ধ্বজ, সুবর্ণময় ধনুক ও দুইটি অক্ষয় তূণও লাভ করেছেন যা তাঁর শক্তিকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। তিনি এ কথাও জানলেন যে দৈত্যরাজ বলিকে ভৃগুপুত্র দেবারিগুরু শুক্রাচার্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সাহায্য করেছেন। তাঁরাই আবার দৈত্যরাজকে দিয়ে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করে তাঁর কীর্তি দশদিকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। দৈত্যরাজ বলি তখন নক্ষত্রখচিত আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রসম বিরাজমান ছিলেন।

দেবতাদের দুর্দশা মহর্ষি কশ্যপকে উদ্বিগ্ন করল। তিনি দেবমাতা অদিতিকে বারো দিন ব্যাপী পয়োব্রত করবার পরামর্শ দিলেন। দেবমাতা অদিতি পতির আদেশ পালন করে অতীব সংযত চিত্তে পয়োব্রত পালন করলেন। মনকে তিনি পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে নিমজ্জিত রেখে সম্পূর্ণ সমাধিস্থা হয়ে ব্রত সম্পন্ন করলেন। তখন তাঁর সম্মুখে শ্রীভগবানের আগমন হল।

**তস্যাঃ প্রাদুরভূত্তাত ভগবানাদি পুরুষঃ।**
**পীতবাসাশ্চতুর্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥**

(৮।১৭।৪)

তখন অদিতির সম্মুখে পীতাম্বর—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ আদি পুরুষ শ্রীভগবান বাসুদেব আবির্ভূত হলেন।

শ্রীভগবানকে আবির্ভূত হতে দেখে দেবমাতা অদিতি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করলেন। তিনি বিশ্বপতি রমাপতি যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবানকে দর্শন করে চক্ষুসার্থক করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীভগবানের স্তুতি করতে

লাগলেন—হে ভগবন্ ! আপনি শরণাগত বৎসল। আপনি আমাদের মঙ্গল করুন।

দেবমাতার স্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শ্রীভগবান বললেন—হে দেবী ! তোমার কামনা আমি জানি। কিন্তু দৈত্যরাজ বলিকে পরাজিত করা এখন সম্ভব নয় কারণ দৈব ও ব্রাহ্মণগণ তার অনুকূল থেকে তাকে রক্ষা করছেন। দৈত্যরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেও সুফল লাভের আশা নেই। তবে আমার আরাধনা কখনো ব্যর্থ যায় না। তাই কশ্যপের বীর্যে প্রবেশ করে আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে তোমার অন্যান্য পুত্রদের রক্ষা করব। হে কল্যাণী ! তুমি তোমার পতি মহর্ষি কশ্যপের মধ্যে আমাকে দর্শন করে তাঁর সেবা করো।

এই কথা বলে ভগবান শ্রীহরি অন্তর্ধান করলেন। স্বয়ং ভগবান গর্ভে আসবেন জেনে দেবমাতা অদিতি কৃতকৃত্য হয়ে গেলেন। তিনি ভক্তি সহকারে পতিদেব কশ্যপের সেবা করতে লাগলেন। মহর্ষি কশ্যপ সমাধি যোগে জানতে পারলেন যে ভগবান শ্রীহরি অংশরূপে তাঁর দেহে প্রবেশ করেছেন। কিছুকাল পরেই ভগবান শ্রীব্রহ্মা জানতে পারলেন যে স্বয়ং শ্রীহরি দেবমাতা অদিতির গর্ভে অবস্থান করছেন। তিনি ভগবানের স্তব করতে লাগলেন। শ্রীব্রহ্মার শক্তি ও লীলার স্তুতি শ্রবণ করে অজর অমর ভগবান শ্রীহরি অদিতির গর্ভ থেকে আবির্ভূত হলেন। ভগবান শ্রীহরি তখন চতুর্ভুজরূপে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করে ছিলেন। পীতাম্বরধারী শ্রীহরির নয়নযুগল কমলসম কোমল ছিল।

**শ্যামাবদাতো ঋষরাজকুণ্ডলত্বিষোল্লসচ্ছ্রীবদনাম্বুজঃ পুমান্।**
**শ্রীবৎসবক্ষা বলয়াঙ্গদোল্লসৎকিরীটকাঞ্চীগুণচারুনূপুরঃ॥**

(৮।১৮।২)

তাঁর শ্রবণে মকরকুণ্ডল আর তার আভায় বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, হস্তদ্বয়ে কঙ্কণ, বাহুদ্বয়ে বলয়, মস্তকে কিরীট, কটিতে চন্দ্রহার ও চরণে নূপুর ছিল, রূপ অনিন্দ্যসুন্দর ছিল।

শ্রীহরি কণ্ঠে বনমালা ধারণ করে ছিলেন যার চতুর্দিকে ভ্রমর গুঞ্জন করছিল। কণ্ঠে ছিল কৌস্তুভ মণি। তাঁর অঙ্গজ্যোতিতে মহর্ষি কশ্যপের গৃহ

আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শ্রীভগবানের আবির্ভাব কালে দিকসকল নির্মল হয়ে গেল। নদী ও সরোবরের জল স্বচ্ছ হয়ে গেল। তখন ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্র অভিজিৎ মুহূর্ত— যা আজও 'বিজয়া দ্বাদশী' তিথি রূপে পরিচিত হয়। শ্রীভগবানের আবির্ভাব কালে শঙ্খ, ঢোল, মৃদঙ্গ, পণব, আনক আদি বাদ্যসকল বাজতে লাগল। গন্ধর্বগণ গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগল। মুনি, দেবতা, মনু, পিতৃপুরুষ ও অগ্নি শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন। অদিতির আশ্রম পুষ্পবৃষ্টিতে ভরে গেল। দেবমাতা অদিতি ও প্রজাপতি কশ্যপ শ্রীভগবানকে যোগমায়ার দ্বারা দেহ ধারণ করতে দেখে বিস্মিত হয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। শ্রীভগবান স্বয়ং অব্যক্ত ও চিৎস্বরূপ। এইবার শ্রীভগবান কশ্যপ ও অদিতির সম্মুখেই বামন ব্রহ্মচারীর রূপ ধারণ করলেন।

ভগবান বিষ্ণুকে বামন ব্রহ্মচারীর রূপে দর্শন করে মহর্ষিগণের আনন্দ হল। তাঁরা প্রজাপতি কশ্যপকে সম্মুখে রেখে তঁর জাতকর্ম আদি সম্পন্ন করলেন। যখন উপনয়নের সময় হল তখন গায়ত্রীর অধিষ্ঠাতা দেবতা স্বয়ং সূর্যদেব বামনকে গায়ত্রী উপদেশ দান করলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি দিলেন উপবীত এবং কশ্যপ পরালেন মেখলা। পৃথিবী দিলেন কৃষ্ণচর্ম, বনসমূহের পতি চন্দ্র দিলেন দণ্ড, মাতা অদিতি দিলেন কৌপীন ও কটিবস্ত্র এবং আকাশের দেবতারা বামন বেশধারী শ্রীভগবানকে ছত্র প্রদান করলেন। অবিনশ্বর শ্রীভগবানকে বেদগর্ভ ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ দিলে কুশ ও সরস্বতী দিলেন রুদ্রাক্ষের মালা। ভগবান বামনদেবকে যক্ষরাজ কুবের দিলেন ভিক্ষা পাত্র ও সতী জগজ্জননী ভগবতী উমা স্বয়ং ভিক্ষা দিলেন। এইভাবে বটুকবেশধারী ভগবান বামনদেব নিজ ব্রহ্মতেজ দ্বারা ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত হয়ে সেই সভাতে অতিশয় শোভমান হলেন। অতঃপর তিনি হোম ক্রিয়াও করলেন।

এমন সময়ে ভগবান বামনদেব শুনলেন যে সর্বগুণসম্পন্ন যশস্বী বলি ভৃগুবংশের ব্রাহ্মণদের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করছেন। তিনি সেই স্থানে গমন করলেন। যজ্ঞস্থল ছিল নর্মদানদীর উত্তর তটে 'ভৃগুকচ্ছ' নামক

স্থানে যা অতি মনোরম দেখাচ্ছিল। ভৃগুবংশীয় ঋত্বিকগণ বলিকে দিয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান যথোচিত ভাবে সম্পন্ন করাচ্ছিলেন। তখনই তাঁরা দূর থেকে উদীয়মান সূর্যসম বামন ভগবানকে আসতে দেখলেন। বামন ভগবানের তেজে যাজ্ঞিক যজমান বলি ও অন্যান্য সকলের তেজ নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তাঁরা ভাবলেন হয়ত যজ্ঞ দর্শন করবার জন্য স্বয়ং সূর্যদেব, অগ্নিদেব অথবা ঋষি সনৎ কুমার এসেছেন। এইবার যজ্ঞস্থলে ছত্র, দণ্ড, জল-পূর্ণ কমণ্ডলু নিয়ে ভগবান বামনদেবের প্রবেশ হল। তাঁর কটিদেশে ছিল মুণ্ডমেখলা, কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত, মৃগচর্মের উত্তরীয় ও মস্তকে জটা।

শ্রীভগবানকে সকলে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। দৈত্যরাজ বলি পরমানন্দে স্বাগত সম্ভাষণ করলেন ও তাঁর পাদ পক্ষালন করে পূজার্চনা করে বলি ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর বলি স্তুতি করে বললেন— হে ব্রাহ্মণকুমার ! আপনি স্বাগত। আপনাকে নমস্কার। আজ আমার গৃহ ও বংশ পবিত্র হল। আমার যজ্ঞ সফল হল। হে পরমপূজ্য ব্রহ্মচারী ! আপনি যা কিছু প্রার্থনা করবেন তাই আপনাকে দান করব। আপনি গাভী, স্বর্ণ, উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত আবাস, পবিত্র অন্ন, পেয়, বিবাহের জন্য ব্রাহ্মণ কন্যা, সমৃদ্ধ গ্রাম, অশ্ব-গজ, রথও চাইতে পারেন।

শ্রীভগবান বললেন —হে রাজন্ ! আপনার কথাগুলি আপনার কুলমর্যাদার অনুরূপ, ধর্মযুক্ত, যশস্কর ও মধুর। আপনি ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য ও আপনার প্রবীণ পিতামহ ও পরম প্রশান্ত প্রহ্লাদের আদেশও পালন করে থাকেন। আপনার বংশে কখনো সম্পদবিহীন অথবা কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেননি ; এমন কখনো হয়নি যে ব্রাহ্মণকে দান করা হয়নি অথবা দান করবার অঙ্গীকার করে কেউ তা রক্ষা করেনি। আপনার পিতা বিরোচন ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। এমনকী শত্রু দেবতাগণ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে যখন তাঁর আয়ু প্রার্থনা করেন, তিনি সব কিছু জানতে পেরেও নিজ আয়ু সেই ব্রাহ্মণবেশধারী দেবতাকে দান করে দিয়েছিলেন।

**তস্মাৎ ত্বত্তো মহীমীষদ্ বৃণেঽহং বরদর্ষভাৎ।**
**পদানি ত্রীণি দৈত্যেন্দ্র সংমিতানি পদা মম॥**

(৮।১৯।১৬)

হে দৈত্যরাজ ! আপনি শ্রেষ্ঠ দানবীর রূপে বিখ্যাত। সেইজন্য আমি আপনার কাছে আমার পাদপরিমিত সামান্য ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করছি।

হে রাজন্ ! আমি জানি যে আপনি রাজাধিরাজ ও উদারচেতা। তবু আমার এর বেশি কিছু চাহিদা নেই। বিদ্বজ্জন যেমন প্রয়োজন তেমনই দান গ্রহণ করে থাকেন তাহলে আর তাঁকে পাপে লিপ্ত হতে হয় না।

দৈত্যরাজ বলি উত্তর দিলেন—হে ব্রাহ্মণকুমার ! আপনি বাক্যে প্রবীণদের মতন হলেও দেখছি আপনার বুদ্ধি শিশুসুলভ। সম্ভবত বালক বলে আপনি নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারেন না। আমি ত্রিলোকের অধিপতি ; আমি আপনাকে একাধিক দ্বীপ দান করতেও সক্ষম। আপনাকে তো বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে না। তিনপদ ভূমি চাওয়া কি আদৌ বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে ?

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন—হে রাজন্ ! অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয় না। চিরকাল সে অতৃপ্তই থাকে। সম্পত্তি ও ভোগ্য বস্তুতে সন্তুষ্ট না হওয়ার জন্যই জীবকে বারে বারে সংসার চক্রে আবর্তিত হতে হয়। সন্দেহ নেই যে আপনি শ্রেষ্ঠ বরদ। তাই শুধু তিন পদ ভূমি আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চেয়েছি। এতেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। এর অধিক কী করে যাচনা করি !

দৈত্যরাজ বলি তখন শ্রীবামনদেব ভগবানকে তা দান করতে রাজি হয়ে গেলেন। ভূমিদানের সংকল্প করবার জন্য তিনি জলপাত্র তুলে নিলেন। কুলগুরু শুক্রাচার্যের কাছে কিছুই গোপন ছিল না। তিনি শ্রীভগবানের এই লীলা জানতেন। রাজা বলিকে ভূমিদানে উদ্যত দেখে তিনি বললেন— হে বিরোচননন্দন ! ইনি স্বয়ং অনন্ত শ্রীবিষ্ণু ভগবান। দেবকার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর অদিতির গর্ভে অবতরণ। তুমি ত্রি-পদ ভূমির তাৎপর্য না জেনে দানের প্রতিজ্ঞা করলে দৈত্যকুলের ক্ষতি হবে। তিনি যোগমায়ার আশ্রয়ে ব্রহ্মচারীরূপ ধারণ করে উপস্থিত হয়েছেন। এই বিশ্বরূপ ভগবান তিন পদে ত্রিভুবন অধিকার করে নেবেন। তুমি মূর্খ। সর্বস্ব শ্রীবিষ্ণুকে দান করে দিলে যে তোমার থাকবার জায়গাও থাকবে না। সুতরাং বিরত হও।

রাজা বলি বললেন— হে গুরুদেব ! আপনি যা বলেছেন তা বিশেষ

অর্থবহ। কিন্তু হে প্রভু ! আমি প্রহ্লাদের পৌত্র আর দান দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হতে পারব না। এতে কুলগুরু শুক্রাচার্য বলিকে অভিশাপ দিয়ে বললেন—মূর্খ ! অজ্ঞানী হয়ে নিজেকে পণ্ডিত মনে করছ। আমার পরামর্শ উপেক্ষা করলে তুমি অচিরেই লক্ষ্মীচ্যুত হবে।

গুরুদেবের অভিশাপও দৈত্যরাজ বলিকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। বামনদেবকে বিধিপূর্বক পূজা করে এবং হস্তে জল গ্রহণ করে তিনি তিন পদ ভূমি দানের সংকল্প করলেন। অতঃপর তিনি ভগবান বামনদেবের পাদপ্রক্ষালন করে সেই চরণামৃত মস্তকে ধারণ করলেন। দৈত্যরাজ বলির নিষ্কপট আচরণ সর্বত্র প্রশংসিত হল ও তাঁর উপর পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল। সজ্ঞানে ত্রিভুবন শত্রুকে দান করে তিনি প্রণম্য হয়ে গেলেন।

**তদ্ বামনং রূপমবর্ধতাদ্ভুতং হরেরনন্তস্য গুণত্রয়াত্মকম্।**
**ভূঃ খং দিশো দ্যৌর্বিবরাঃ পয়োধয়স্তির্যঙ্‌নৃদেবা ঋষয়োযদাসত॥**
(৮।২০।২১)

এমন সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। ভগবান অনন্ত শ্রীহরির সেই ত্রিগুণাত্মক বামনমূর্তি স্ফীত হতে লাগল। তখন সেই বিরাটরূপে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দিকসকল, স্বর্গ, পাতাল, সমুদ্র, পশুপক্ষী, মানুষ, দেবতা ও ঋষিগণ—সবকিছুই তাঁর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

সমস্ত জগৎকে শ্রীভগবানে স্থিত দেখে অসুরগণ ভীষণ ভয় পেল। সেই বিরাটরূপে শ্রীভগবানের হস্তে ছিল পরম শক্তিশালী সুদর্শন চক্র, মেঘসম গর্জনযুক্ত শার্ঙ্গধনু, গুরুগম্ভীর নিনাদকারী পাঞ্চজন্য শঙ্খ, প্রচণ্ড কৌমোদকী গদা, শত চন্দ্র চিহ্নযুক্ত বিদ্যাধর অসি ও দুইটি অক্ষয় তূণ। লোকপালদের সঙ্গে সুনন্দ আদি মুখ্য পার্ষদগণ শ্রীভগবানকে স্তব করছিলেন। অনিন্দসুন্দর ছিল শ্রীভগবানের বিগ্রহ। তাঁর মস্তকে কিরীট, বাহুতে অঙ্গদ, কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তভ মণি, কটিদেশে মেখলা ও স্কন্ধে পীতাম্বর শোভমান ছিল। শ্রীভগবানের কণ্ঠে পাঁচ রকমের পুষ্পমাল্য শোভা পাচ্ছিল যাতে মধুলোভী ভ্রমররা গুঞ্জরণ করছিল। শ্রীভগবান এক পদে বলির সমগ্র রাজ্যলক্ষ্মী, দেহদ্বারা আকাশ এবং বাহুসকল দ্বারা দিকসকল আবৃত করলেন। দ্বিতীয় পদে তিনি স্বর্গলোক

অধিকার করলেন। তৃতীয় পদভূমির জন্য বলির কাছে সামান্যতম স্থানও রইল না। শ্রীভগবানের সেই দ্বিতীয় পদ উপরের দিকে অগ্রসর হতে হতে মহর্লোক, জনলোক ও তপলোকের উপরে সত্যলোকে পৌঁছে গেল। তাঁর বিশ্বরূপ দেখে সকলে অবাক হল।

ভগবান শ্রীব্রহ্মা দেখলেন যে ভগবান শ্রীহরির শ্রীচরণ উর্ধ্বদিকে প্রসারিত হয়েছে। তিনি শ্রীপ্রভুর সেই শ্রীচরণকে কমণ্ডলুর জল দ্বারা প্রক্ষালন করলেন। শ্রীপাদস্পর্শপূত সেই ব্রহ্মবারি ভগবতী গঙ্গারূপে আকাশ পথে মর্ত্যে আগমন করে ত্রিভুবন পবিত্র করল। এইবার শ্রীভগবান নিজ বিভূতি সম্বরণ করে পুনরায় বামনরূপ ধারণ করলেন এবং ব্রহ্মাদি লোকপালগণ উপহার প্রদান করে করে তাঁর আরাধনা করলেন।

বামনদেবের লীলাচ্ছলে তিনপদভূমি নেওয়ার মাধ্যমে সমগ্র জগৎ অধিকার করার ঘটনা অসুররা প্রত্যক্ষ করল। এইবার দৈত্যরাজ বলির অনুচরগণ অস্ত্রধারণ করে ভগবান বামনদেবকে বধ করবার জন্য ধাবিত হল। বিষ্ণু পার্ষদগণ তাদের বাধা দিল। যুদ্ধে তার অনুচরগণ প্রাণ হারাচ্ছে দেখে দৈত্যরাজ বলি অনুচরদের বিরত করলেন। দৈত্য ও অসুর সেনাপতিগণ দৈত্যরাজের আদেশে রসাতলে প্রবেশ করল। অতঃপর পক্ষীরাজ গরুড় ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অভিপ্রায় জানতে পেরে বরুণ পাশের দ্বারা বলিকে বন্ধন করল। সেই দিনটিই অশ্বমেধ যজ্ঞে সোমরস পানের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। শ্রীভগবান তখন বললেন :

**পদানি ত্রীণি দত্তানি ভূমের্মহ্যং ত্বয়াসুর।**
**দ্বাভ্যাং ক্রান্তা মহী সর্বা তৃতীয়মুপকল্পয়॥**

(৮।২১।২৯)

হে অসুর ! তুমি আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান করেছ, আমি দুই পদেই ত্রিলোক অধিকার করে নিয়েছি এখন তৃতীয় পদের জন্য স্থান প্রদান কর।

প্রার্থীকে দান করবার অঙ্গীকার করে বিমুখ হলে নরক বাস করতে হয়। কিন্তু দৈত্যরাজ ধৈর্য সহকারে উত্তর দিলেন—অবশ্যই আমি আমার বাক্যের সত্যতা রক্ষা করব। আপনাকে বঞ্চনা করব না। আপনি কৃপা করে আপনার তৃতীয় পদ আমার মস্তকে রাখুন। আমি নরককে ভয় পাইনা, অপকীর্তিকে

ভয় করি। আমার পিতামহ প্রহ্লাদ আপনার অকুতোভয় ও অবিনাশী শ্রীপাদপদ্মকে আশ্রয় করেছিলেন। আপনি আমাকেও আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিন। আমি ঐশ্বর্য মদে উন্মত্ত হয়েছিলাম আপনি জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করে করুণা করেছেন।

তখন ভগবান শ্রীব্রহ্মা এসে দৈত্যরাজকে বন্ধন মুক্ত করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে শ্রীভগবান বললেন—হে ব্রহ্মন্! আমি যাকে কৃপা করি তার সর্বস্ব অপহরণ করে থাকি। মদমত্ত হলেই অবজ্ঞার জন্ম হয়ে থাকে। দৈত্যরাজ বলি সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করেনি। তাই আমি তাকে এমন দুর্লভ পদ প্রদান করছি যার জন্য শ্রেষ্ঠ দেবতাগণও লালায়িত থাকেন। সাবর্ণি মন্বন্তরে আমার এই ভক্ত ইন্দ্রত্ব লাভ করবে। ততদিন এ বিশ্বকর্মা নির্মিত সুতল লোকে বাস করবে। আমার কৃপায় সেইখানে শারীরিক অথবা মানসিক ক্লেশ, ক্লান্তি, তন্দ্রা, আলস্য, শত্রু থেকে পরাভব ও উপসর্গ দ্বারা ক্লেশ ভোগ করতে হয় না।

অতঃপর শ্রীভগবান দৈত্যরাজকে বললেন— হে মহারাজ ইন্দ্রসেন ! মহারাজ বলি ! তোমার মঙ্গল হোক। এখন আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে সুতললোকে গমন কর, স্বর্গের দেবতাগণও সেখানে বাস করতে ইচ্ছুক থাকেন। তুমি অজেয় থাকবে আর আমার সুদর্শন চক্র তোমাকে সর্বদা রক্ষা করবে। আমি তোমাদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করব। হে বীর ! তুমি সতত আমাকে তোমার কাছেই দেখতে পাবে।

দৈত্যরাজ বলি বরুণপাশ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীভগবানকে, শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশঙ্করকে প্রণাম করে কৃতকৃত্য হয়ে গেলেন আর সুতল লোকে গমন করলেন।

**এবমিন্দ্রায় ভগবান্ প্রত্যানীয় ত্রিবিষ্টপম্।**
**পূরয়িত্বাদিতেঃ কামমশাসৎ সকলং জগৎ॥**

(৮।২৩।৪)

এইভাবে শ্রীভগবান বলির নিকট স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করে ইন্দ্রকে প্রদান করে অদিতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন ও স্বয়ং ত্রিভুবন পরিপালন করতে লাগলেন।

———o———

# মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র

মহারাজ খটাঙ্গ ছিলেন সূর্যবংশজাত। তাঁর বংশে যথাক্রমে দীর্ঘবাহু, রঘু, অজ ও দশরথ রাজা হয়েছিলেন। দেবতাদের প্রার্থনায় সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিই নিজ অংশাংশরূপে শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন— এই চার নামে রাজা দশরথের চার পুত্র রূপে মর্ত্যধামে অবতরণ করেন।

**গুবর্থে ত্যক্তরাজ্যো ব্যচরদনুবনং পদ্মপদ্ভ্যাং প্রিয়ায়াঃ**
**পাণিস্পর্শাক্ষমাভ্যাং মৃজিতপথরুজো যো হরীন্দ্রানুজাভ্যাম্।**
**বৈরূপ্যাচ্ছূর্পণখ্যাঃ প্রিয়বিরহরুষাঽঽরোপিতভ্রূবিজৃম্ভ**
**ত্রস্তাব্ধির্বদ্ধসেতুঃ খলদবদহঃ কোসলেন্দ্রোঽবতান্নঃ।।**

(৯।১০।৪)

মহাত্মা শুকদেব বললেন—হে পরিক্ষিৎ ! ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পিতা রাজা দশরথের সত্য রক্ষা করবার জন্য রাজত্ব ত্যাগ করে বনগমনও করেছিলেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম কুসুম কোমল ছিল যা ভার্যা জানকীর করকমল স্পর্শও সহ্য করতে পারত না। সেই সুকোমল চরণযুগল যখন বন্ধুর অরণ্য পথে বিচরণ করতে করতে ক্লিষ্ট হয়ে পড়ত তখন অনুজ লক্ষ্মণ ও ভক্ত হনুমান তার সেবা করেছিলেন। শূর্পণখাকে নাসিকা-কর্ণ বিরহিত করে দেওয়ায় তাঁকে নিজ প্রিয়তমা জানকীদেবীর বিরহ যাতনাও সহ্য করতে হয়েছিল। এই বিরহ কারণে ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়েছিল যা দেখে সমুদ্র পর্যন্ত ভীত হয়েছিল। অতঃপর তিনি সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় যান এবং দুষ্ট রাক্ষসারণ্যকে দাবাগ্নি সম ভস্ম করেন। সেই অযোধ্যাপতি আমাদের রক্ষা করুন।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মহামুনি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে অনুজ লক্ষ্মণের সাহায্য ছাড়াই মারীচাদি রাক্ষসদের বধ করেন। অতঃপর তাঁর মিথিলায় আগমন হয়। জনকপুর মিথিলায় সীতাদেবীর স্বয়ংবর সভা হচ্ছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

বীরদের সভায় এক ভয়ানক হরধনু রাখা ছিল। ধনুক এত গুরুভার ছিল যে তা বহন করে আনতে তিন শত বীরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অনায়াসে সেই ধনুকে জ্যারোপ করে তা টেনে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল যেন হস্তীশাবক ক্রীড়াচ্ছলে ইক্ষুদণ্ড দ্বিখণ্ডিত করল।

**জিত্বানুরূপগুণশীলবয়োহঙ্গরূপাং সীতাভিধাং শ্রিয়মুরস্যভিলব্ধমানাম্।**
**মার্গে ব্রজন্ ভৃগুপতের্ব্যনয়ৎ প্ররূঢ়ং দর্পং মহীমকৃত যস্ত্রিররাজবীজাম্॥**

(৯।১০।৭)

শ্রীভগবান যাঁকে বক্ষঃস্থলে সসম্মানে স্থান দিয়েছেন সেই দেবী মহালক্ষ্মীই সীতাদেবী নামে জনকনন্দিনীরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তিনি রূপে, গুণে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের যোগ্যা ছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হরধনুভঙ্গ করে তাঁকেই লাভ করেছিলেন। অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালে শ্রীপরশুরামের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। এই শ্রীপরশুরামই একুশ বার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয় নৃপতি বিরহিত করেছিলেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর দর্প খর্ব করেন।

অতঃপর তিনি পিতৃসত্য রক্ষা করবার জন্য অরণ্যবাস স্বীকার করেন। স্ত্রৈণ রাজা দশরথ পত্নীর কাছে সত্যরক্ষার্থে বাঁধা পড়েছিলেন। তাই শ্রীভগবান পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য করেন এবং অনাসক্তক যোগী যেরূপ অবহেলায় প্রাণত্যাগ করেন তদনুরূপভাবে তিনি প্রাণপ্রিয় রাজ্য, সম্পদ, আত্মীয়, সুহৃদ, মিত্র ও রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পত্নী সীতাদেবীকে নিয়ে বনে যাত্রা করেছিলেন।

অরণ্যে গমন করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসরাজ রাবণের ভগিনী শূর্পণখাকে নাসিকা-কর্ণ বিরহিত করে দেন কারণ তার বুদ্ধি কলুষিত ও কামনা বাসনায় পূর্ণ ছিল। শূর্পণখার সাহায্যকারী খর ও দূষণ, ত্রিশিরা আদি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিনাশ করেন আর অতিশয় ক্লেশ পরিপূর্ণ অরণ্যে নানা স্থানে বাস করতে থাকেন।

যখন রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাদেবীর রূপ-গুণ-সৌন্দর্য আদির কথা শুনল তখন তার চিত্ত কামনা বাসনায় আতুর হল। সে অদ্ভুত হরিণ রূপে

রাক্ষস মারীচকে শ্রীরামচন্দ্রের পর্ণকুটিরের নিকট প্রেরণ করল। হরিণ শ্রীভগবানকে সেইখান থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। অবশেষে শ্রীভগবান সেই হরিণকে অনায়াসে নিহত করলেন যেভাবে বীরভদ্র দক্ষ প্রজাপতিকে মেরেছিল। যখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পর্ণকুটির থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন, তখন লক্ষ্মণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে অধম রাক্ষস রাবণ নেকড়ের মতন, অসহায় সীতাদেবীকে হরণ করল। অতঃপর প্রাণপ্রিয় সীতাদেবীকে হারিয়ে অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে শ্রীভগবান গভীর অরণ্যে দীনহীন ভাবে বিচরণ করতে লাগলেন।

অতঃপর শ্রীভগবান জটায়ুর দেহ সৎকার করলেন। অবশ্য জটায়ু ভগবৎকর্মের ফলে পূর্বেই সর্বকর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি কবন্ধ বধ করেন আর আরও পরে সুগ্রীবাদি বানরদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বালী বধ করেন আর সেই বানরদের সাহায্যেই সীতাদেবীর সন্ধান পেয়ে নরলীলা করতে করতে বানর সৈন্যসহ সমুদ্র তীরে উপনীত হন। সহজ প্রার্থনার পথে সফল না হয়ে শ্রীভগবান ক্রোধলীলা প্রদর্শন করে সমুদ্রের উপর দৃষ্টিপাত করতেই জলজ প্রাণীগণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। সমুদ্র ভয় পেয়ে শান্ত হল আর অর্ঘ্যাদি উপহার নিয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হয়ে বলল :

**ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো নু বিদাম ভূমন্ কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্।**
**যৎসত্ত্বতঃ সুরগণা রজসঃ প্রজেশা মন্যোশ্চ ভূপতয়ঃ স ভবান্ গুণেশঃ।।**

(৯।১০।১৪)

হে অনন্ত ! আমরা মূর্খ ; তাই আপনার প্রকৃত স্বরূপ জানি না। জানব কেমন করে ? আপনি সমগ্র জগতের একমাত্র প্রভু, আদিকারণ ও নির্বিকার। আপনি ত্রিগুণের প্রভু। তাই যখন আপনি সত্ত্বগুণ ধারণ করেন তখন দেবতাদের যখন রজোগুণ ধারণ করেন তখন প্রজাপতিদের আর যখন তমোগুণ ধারণ করেন তখন সক্রোধে রুদ্রগণকে উৎপন্ন করেন।

হে বীরশিরোমণি ! আপনি আমার উপরে একটা সেতু নির্মাণ করে দিন যাতে আপনার কীর্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় আর আগামী দিনের দিগ্বিজয়ী নৃপতিগণ আপনার যশোগান করে ধন্য হয়।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বহু প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করলেন। অতঃপর শরণাগত বিভীষণের পরামর্শ অনুসারে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব, নীল, হনুমান আদি বীরদের সঙ্গে নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। সেই লঙ্কা সীতাদেবীর অন্বেষণ কালে হনুমান পূর্বেই দগ্ধ করেছিলেন। বানরসৈন্য বিচরণস্থলী, ক্রীড়ার জন্য নির্মিত স্থান, শস্য-ভাণ্ডার, রাজকোষ, সিংহদ্বার, সভাভবন আদি অবরোধ করল। তারা সেইখানকার বেদি, ধ্বজার স্বর্ণকলস ও চৌরাস্তা সকল তছনছ করে দিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে রাক্ষসরাজ রাবণ নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, দুর্মুখ, সুরান্তক, নরান্তক, প্রহস্ত, অতিকায়, বিকম্পন আদি অনুচর, পুত্র মেঘনাদ ও শেষে ভ্রাতা কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে প্রেরণ করল। রাক্ষসদের সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী তরবারি, ত্রিশূল, ধনুক, প্রাস, ঋষ্টি, শক্তি, বান, তোমর, খড়গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ছিল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, হনুমান, গন্ধমাদন, নীল, অঙ্গদ, জাম্বুবান ও পনসাদি সেনাপতিদের নিয়ে রাক্ষসসৈন্যের সম্মুখীন হলেন। রঘুবংশশিরোমণি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গদ প্রভৃতি সেনাপতিগণ রাক্ষসদের চতুরঙ্গ সৈন্যকে বৃক্ষ, গিরিশৃঙ্গ, গদা ও শরাঘাতে পর্যুদস্ত করতে লাগলেন। তাদের মৃত্যু তো অবধারিত ছিল কারণ তারা তো রাবণের অনুচর যাদের সকল পুণ্যফল সীতাদেবীকে স্পর্শ করার ফলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

যখন রাক্ষসরাজ রাবণ দেখল যে তার সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে তখন সে পুষ্পক রথে চড়ে যুদ্ধ করতে এল। তখনই ইন্দ্রের সারথি মাতলি অতিশয় তেজময় দিব্য রথ নিয়ে এল আর তার উপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বিরাজমান হলেন। রাবণ নিজ সুতীক্ষ্ণ শরাঘাতে শ্রীভগবানের উপর আঘাত হানতে লাগল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তখন বললেন—ওরে অধম রাক্ষস ! তুমি সারমেয় সম আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্যাকে হরণ করে এনেছো। তুমি তোমার কৃতকর্মের ফল ভোগ কর। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র এইভাবে রাবণকে তিরস্কার করে শরাঘাত করলেন। সেই বজ্রসম ভয়ংকর শর রাবণকে বক্ষঃস্থলে আঘাত হানল আর সে দশ মুখ দিয়ে রক্তবমন করতে করতে পুষ্পক রথ থেকে নিচে পড়ে গেল। সে যেন পুণ্যক্ষয় হওয়ার

জন্য স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হল। মৃত রাবণকে দেখে ভার্যা মন্দোদরী বিলাপ করতে লাগল।

এরপর অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে দিয়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে মৃত রাক্ষসদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করালেন। অতঃপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অশোকবনের আশ্রমে অশোক বৃক্ষের তলায় নজর বন্দিনী সীতাদেবীকে দেখতে গেলেন। সীতাদেবী বিরহ ব্যাধিতে পীড়িত ও কৃশ হয়ে ছিলেন। প্রিয়তমাকে দীনহীন অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। এদিকে পতিকে দেখতে পেয়ে সীতাদেবীর শ্রীমুখ কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হল। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে রাক্ষসদের অধিপতি, লঙ্কার রাজত্ব ও কল্পান্ত পরমায়ু প্রদান করে ধন্য করলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী, ভ্রাতা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও সেবক হনুমানকে নিয়ে বিমানে করে নিজ দেশে যাত্রা করলেন।

দেবতাগণ আনন্দে শ্রীভগবানের লীলা সংকীর্তন করছিলেন। এই সময়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র জানতে পারলেন যে অনুজ ভরত তাপস বেশে জীবন যাপন করছে। ভরতের দীনহীন অবস্থা প্রভুর মনকে ব্যথিত করল। শ্রীভরত যখন জানতে পারলেন যে তাঁর অগ্রজ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ফিরে আসছেন তখন তিনি অযোধ্যাবাসী, মন্ত্রী ও পুরোহিতদের সঙ্গে শ্রীভগবানের পাদুকা মাথায় নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনবার জন্য যাত্রা করলেন। সঙ্গে তাঁর বাদক, বেদমন্ত্র উচ্চারণকারী ব্রাহ্মণ, সুসজ্জিত পতাকাবাহী অশ্বারোহী ও স্বর্ণকবচমণ্ডিত সৈন্যদল ছিল। শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেই ভরত অশ্রুপূর্ণলোচনে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। প্রভুর সম্মুখে তাঁর পাদুকা রেখে তিনি হাতজোড় করে দাঁড়ালেন। ভ্রাতাযুগল অশ্রুপূর্ণ নয়নে মিলিত হলেন। প্রভুকে দর্শন করে প্রজাগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল।

পাদুকে ভরতোহনৃহ্লাচ্চামরব্যক্তনোত্তমে।
বিভীষণঃ সসুগ্রীবঃ শ্বেতচ্ছত্রং মরুৎসুতঃ।।
ধনুর্নিষঙ্গাঞ্জক্রঘ্নঃ সীতা তীর্থকমনণ্ডলুম্।
অবিভ্রদঙ্গদঃ খড়্গং হৈমং চর্মক্ষারণ্ নৃপ।।
(৯।১০।৪৩-৪৫)

শ্রীভরত শ্রীভগবানের পাদুকা ধারণ করলেন, বিভীষণ উত্তম চামর, সুগ্রীব ব্যজন আর শ্রীহনুমান শ্বেতছত্র গ্রহণ করলেন। শ্রীশত্রুঘ্নর হস্তে ছিল ধনুক ও তূণদ্বয়, সীতাদেবীর হস্তে ছিল তীর্থবারি পূর্ণ কমণ্ডলু, অঙ্গদের হস্তে সুবর্ণ নির্মিত খড়্গ ও জাম্বুবানের হস্তে ঢাল।

**পুষ্পকস্থোহন্বিতঃ স্ত্রীভিঃ স্তূয়মানশ্চবন্দিভিঃ।**
**বিরেজে ভগবান্ রাজন্ গ্রহৈশ্চন্দ্র ইবোদব॥**

(৯।১০।৪৫)

সকলের সম্মুখে শ্রীভগবান পুষ্পক বিমানে বিরাজমান হলেন, রমণীগণ যথাস্থানে বসলেন। বন্দকগণ স্তুতিগান করতে লাগল। তখন পুষ্পক বিমানের উপর ভগবানের অনন্ত সৌন্দর্যে যেন গ্রহগণ পরিবৃত চন্দ্রোদয় হয়েছে মনে হচ্ছিল।

ভ্রাতাদের অভিনন্দন গ্রহণ করে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন। গুরুজনদের প্রণাম ও ছোটদের আলিঙ্গন আদি সবই যথাযথভাবে সম্পন্ন হল। সীতাদেবী ও লক্ষ্মণও যথাযোগ্য ব্যবহার করলেন। মাতাদের অনুভূতি বর্ণনাতীত ছিল ; যেন মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হল। পরম আহ্লাদে মাতাগণ পুত্রদের অঙ্কে স্থান দিয়ে অশ্রু বিসর্জন করে অভিষেক করে দিলেন। সকল শোকের অবসান হল।

অতঃপর গুরু বশিষ্ঠদেব শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে শ্রীভগবানের জটা সরিয়ে দিলেন। বৃহস্পতি যেমন ভাবে ইন্দ্রের অভিষেক করেছিলেন তেমন ভাবেই চার সমুদ্রের জল দিয়ে শ্রীভগবানের অভিষেক হল। স্নানান্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সুন্দর বস্ত্রালংকার ও পুষ্পমাল্য ধারণ করলেন। ভ্রাতাগণ ও সীতাদেবীও সুন্দর বস্ত্রালংকারে সজ্জিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে অনিন্দ্য সুন্দর লাগছিল।

**অগ্রহীদাসনং ভ্রাতা প্রণিপত্য প্রসাদিতঃ।**
**প্রজাঃ স্বধর্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতাঃ।**
**জুগোপ পিতৃবদ্ রামো মেনিরে পিতরং চ তম্॥**

(৯।১০।৫১)

শ্রীভরত তাঁর চরণে পতিত হয়ে প্রভুকে প্রসন্ন করলেন আর তাঁর ইচ্ছায়

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর তিনি নিজ নিজ ধর্মে তৎপর ও বর্ণাশ্রমজনিত আচরণকারী প্রজাদের পিতাসম পালন করতে থাকলেন। প্রজাগণ তাঁকে পিতাসম শ্রদ্ধা করতে থাকল।

রামরাজ্য ত্রেতাযুগে হলেও তখন মনে হয়েছিল সত্যযুগের আগমন হয়েছে। অরণ্য, নদী, পর্বত, বর্ষ, দ্বীপ ও সমুদ্র সকল কামধেনুসম প্রজাদের সকল কামনা পূর্ণকারী হয়েছিল।

**নাধিব্যাধিজরাগ্লানিদুঃখশোকভয়ক্লমাঃ ।**
**মৃত্যুশ্চানিচ্ছতাং নাসীদ্ রামে রাজন্যধোক্ষজে॥**

(৯।১০।৫৪)

ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে কারও মানসিক চিন্তা অথবা শারীরিক রোগ ছিল না। জরা, দুর্বলতা, দুঃখ, শোক, ভয় ও ক্লান্তি কোনও ব্যক্তিকে স্পর্শ করত না। মৃত্যু কামনা না করলে মৃত্যু হত না।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এক পত্নী ব্রত ধারণ করেছিলেন। তাঁর শীল, অতি পবিত্র ও রাজর্ষিসম ছিল। তিনি গৃহস্থোচিত স্বধর্ম শিক্ষা দান করবার জন্য স্বয়ং সেই ধর্মাচরণ করেছিলেন। সতী শিরোমণি সীতাদেবী পতিদেবতার অন্তরের কথা জানতেন। তিনি প্রেম, সেবা, আনুগত্য, বিনয়, বুদ্ধি ও লজ্জা ইত্যাদি গুণ দ্বারা পতি শ্রীরামচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতেন।

অতঃপর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র গুরু বশিষ্ঠদেবকে নিজ আচার্য করে উত্তম সামগ্রী দ্বারা যজ্ঞ করে যেন নিজ সর্বদেব স্বরূপ স্বয়ং প্রকাশিত আত্মার অর্চনা করলেন। তিনি হোতাকে পূর্ব দিক, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক, অবশিষ্ট ভূমি তিনি আচার্যকে অর্পণ করলেন। তাঁর মতে সম্পূর্ণ ভূমণ্ডলের একমাত্র অধিকারী নিঃস্পৃহ ব্রাহ্মণই হয়। এইভাবে সব দান করে তাঁর কেবল পরিধেয় বস্ত্রালংকারই সম্বল রইল।

যখন আচার্য আদি ব্রাহ্মণগণ দেখলেন যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তো ব্রাহ্মণদেরই নিজ ইষ্টদেবতা জ্ঞান করেন আর তাঁর অন্তরে ব্রাহ্মণের প্রতি অনন্ত প্রীতি, তখন তাঁরা বিগলিত চিত্তে প্রসন্ন হয়ে সমগ্র ভূমি শ্রীভগবানকে ফিরিয়ে দিলেন। তাঁরা বললেন— আপনি অনন্ত জ্ঞানসম্পন্ন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্রকীর্তি পুরুষ। যাঁরা কখনো কোনও ব্যক্তিকে কষ্ট দেয়নি সেই

সকল মহাত্মাদের আপনি নিজ শ্রীপাদপদ্ম দিয়ে রেখেছেন। আপনি ব্রাহ্মণদের নিজ ইষ্টদেবতা জ্ঞান করেন। হে ভগবন্ ! আপনার রামরূপকে আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

এরপরে প্রজাপালনে সীতাদেবীকে মহামুনি বাল্মীকির আশ্রমে প্রেরণ, লব-কুশের জন্ম আর সীতদেবীর পৃথিবীলোকে গমন হয়েছিল। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তেরো সহস্র বৎসর অখণ্ডরূপে অগ্নিহোত্র করলেন। তদনন্তর নিজ স্মরণকারী ভক্তদের অন্তরে নিজ শ্রীপাদপদ্ম — যা দণ্ডকবনে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল স্থাপন করে তিনি আলোকিত পরম জ্যোতির্ময় ধামে গমন করলেন।

**যস্যামলং নৃপসদস্সু যশোঽধুনাপি গায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ো দিগিভেন্দ্রপট্টম্।**
**তং নাকপালবসুপাল কিরীটজুষ্ট পাদাম্বুজং রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে॥**

(৯।১১।২১)

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্মল যশ সর্বপাপহরণকারী। তার পরিব্যাপ্তি এমনই যে তাতে দিগ্‌গজদের শ্যামল অঙ্গও আলোকিত ও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। আজও জ্ঞানীগুণীগণ রাজা মহারাজাদের সভায় সেই যশঃকীর্তন করে থাকেন। স্বর্গের দেবতা ও মর্ত্যের নৃপতিগণ তাঁদের মস্তকের কিরীট দিয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের সেবা করে থাকেন। সেই রঘুকুলশিরোমণি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের শরণাগতি দান করুন।

———o———

# শ্রীভগবানের মথুরা গমন

ভোজ বংশের কংস তখন শূরসেনের মাথুরমণ্ডল ও শূরসেনমণ্ডল ছলে বলে কৌশলে দখল করে মথুরাধিপতিরূপে রাজত্ব করছে। দুর্দম্য কংসকে সমীহ করে চলে না এমন ব্যক্তি তখন বিরল। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বিরোধিতা যেন তার জন্ম-জন্মান্তরের ব্যাধি, কারণ সে যে পূর্ব জন্মের হিরণ্যাক্ষপুত্র সেই কালনেমি রাক্ষস। এমন কংসেরও যখন ভগিনী দেবকীর নবদম্পতি গমনের সময়ের দৈববাণী অথবা দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তানকে বধ করবার সময়ের ভগবতী যোগমায়ার সতর্কবাণী মনে পড়ে, সে অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে। তার মনে পড়ে যায় যে তার পূর্বজন্মের শত্রু তাকে বধ করবার জন্য অন্য স্থানে জন্মগ্রহণ করে বড় হচ্ছে। সে তাই দেবকীর সন্তানের জন্মকালে সেই অঞ্চলের যত শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল তাদেরও বধ করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল কিন্তু তাতে যে সে সফল হয়নি সে কথা সকলেরই বিদিত।

মথুরায় হঠাৎ দেবর্ষি নারদের আগমনে তার সুপ্ত ভীতি আবার নড়েচড়ে বসল। কংস জানতে পারল যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান মনে করে যে কন্যাসন্তানকে সে বধ করতে চেষ্টা করেছিল সে ছিল যশোদানন্দিনী, দেবকীনন্দন আদৌ নয়। দেবকীনন্দন ও রোহিণীনন্দন বৃন্দাবনে বসুদেবের সখা নন্দের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামরূপে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে আর তারাই কংসের অনুচরদের বধ করেছেন। অতএব কংসের মধ্যে ভীতি পুনরুজ্জীবিত হওয়াই স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। সে জানতে পারল যে তার সকল কাজের বাধার জন্য দায়ী বসুদেব।

এই স্থলে একটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে যে এই মহান উপকারটি দেবর্ষি নারদ করতে গেলেন কেন ? বেশ, তো শ্রীভগবান নিজেকে গুপ্ত রেখে লীলা করে যাচ্ছিলেন। পূতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্ত, বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর বধ ও কালিয়নাগ দমন আর গিরি গোবর্ধন ধারণ লীলা

তো বেশ চলছিল। হঠাৎ শ্রীপ্রভুকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার কোনো কারণ ছিল কী ? সুধীজন একটা কারণ এইভাবে বলেন। আমাদের সতত মনে রাখা উচিত যে শ্রীভগবানের ইচ্ছা ছাড়া জগতে কোনো কিছুই হয় না ; গাছের একটা পাতাও নড়ে না। কারো মতে দেবর্ষি নারদ হলেন শ্রীভগবানের মন নিজে। লীলা প্রয়োজনে তিনি যোগমায়ার সাহায্যে সেই ব্যক্তির মনেই সেই প্রকৃত সত্য বোধ জাগিয়ে দেন আর কেউ অজানা কথা হঠাৎ বুঝতে পেরে যায়। এই স্থলে যে শ্রীভগবানের লীলাস্থল বৃন্দাবন থেকে মথুরায় পরিবর্তিত হওয়ার কথা যার প্রধান উদ্দেশ্য কংসাসুর বধ। শ্রীভগবান তাই এই স্থলে চাইলেন যেন তাঁর বৃন্দাবন থেকে মথুরা গমনের ব্যবস্থা এইবার কংস নিজেই করুক, কারণ তাঁর বৃন্দাবন লীলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

বার্তা শ্রবণ করে কংসের ইন্দ্রিয় সকল ক্রোধে কেঁপে উঠল। সে বসুদেবকে বধ করবার জন্য তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ তরবারি তুলে নিল। দেবর্ষি নারদ তাকে বিরত করলেন। তখন সে ভগিনী দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে আবার কারাগারে নিক্ষেপ করল। দেবর্ষি নারদ চলে যাওয়ার পরে কংস কেশীকে ডাকল আর নির্দেশ দিল— তুমি ব্রজভূমিতে গমন করে কৃষ্ণ-বলরামকে বধ করে এস। কেশী আদেশ পালন করতে গমন করল। অতঃপর কংস মুষ্টিক, চাণূর, শল, তোশল আদি মল্লযোদ্ধাদের, মন্ত্রীদের ও মাহুতদের ডাকল আর বলল—হে মহাবীর চাণূর ও মুষ্টিক ! আমি যা বলছি তা মন দিয়ে শোনো। বসুদেবের দুই পুত্র বলরাম ও কৃষ্ণ নন্দর গৃহে ব্রজে বাস করছে। তাদের হাতেই নাকি আমার মৃত্যুর কথা লেখা আছে ! তাই যখন তারা এইখানে আসবে তখন তোমরা তাদের মল্লযুদ্ধে আহ্বান করে মল্লভূমিতেই শেষ করে দেবে। মল্লভূমির চারদিকে দর্শকদের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করাও যাতে তার উপর বসে দেশ-বিদেশের প্রজাগণ সেই মল্লযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে আনন্দ লাভ করে। কংস আবার বলল— হে মাহুত ! তুমি তো খুব বুদ্ধিমান বলেই জানি, অতএব মল্লভূমির প্রবেশ দ্বারেই তোমার কুবলয়াপীড় নামক মদমত্ত হাতিকে ছেড়ে রাখবে যাতে আমার শত্রু কৃষ্ণ-বলরামকে ওই

হাতি মল্লভূমিতে প্রবেশ করবার পূর্বেই মেরে ফেলে। যদি কোনো রকমে তারা কুবলয়াপীড়কে ঠেকাতে সমর্থ হয় তাহলে তারা অবশ্যই মল্লবীর চাণূর ও মুষ্টিকের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

সেইসময়ে অত্যাচারী কংসের হাতে তার পিতা উগ্রসেন বন্দী হয়ে কারাগারে অবরুদ্ধ। জ্যেষ্ঠতাত কন্যা দেবকী ও তার পতি বসুদেবও কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ। অত্যাচার এত বেশি হয়েছিল ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক বংশের লোকেরা নিজ রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করবার অভিলাষে, কংসের শাসন স্বীকার করে মথুরায় থেকে গিয়েছিলেন। যদুবংশের তেমনই এক ব্যক্তি হলেন অক্রূর।

মল্লযুদ্ধ মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও তা ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে হচ্ছে সেরূপ ব্যবস্থা হল। চতুর্দশী তিথিতে বিধি অনুসারে ধনুর্যজ্ঞ আয়োজন করা হল আর তার সাফল্য কামনা করে বরদাতা ভূতনাথ ভৈরবকে তুষ্ট করবার জন্য অনেক পশুবলি করার ব্যবস্থা হল।

কংস এইভাবে বধ্যভূমি প্রস্তুত করে কৃষ্ণ-বলরামকে ঘটনাস্থলে আনবার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করল। সে শ্রেষ্ঠ যদুবংশজাত শ্রীঅক্রূরকে ডেকে আনালো আর তাঁর দুই হাত ধরে সবিনয়ে বলল— হে শ্রদ্ধেয় শ্রীঅক্রূর ! আপনি পরম উদার চিত্ত ও দানবীর তাই আপনি আমার সর্বতোভাবে প্রিয় পাত্র। ভোজ ও বৃষ্ণিবংশে আপনার মতন আমার হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই। আজ বন্ধুবরের কাছ থেকে সাহায্য চাইছি। কাজটা অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না তাই আপনার কাছেই নিবেদন করছি। আপনি তো জানেন যে ইন্দ্র সর্বকার্যে সামর্থ্য রাখলেও তা বিষ্ণুর সাহায্য নিয়েই করে থাকেন। এইটা অনেকটা তেমনই।

আপনি সত্বর নন্দরায় সকাশে ব্রজে গমন করুন। সেইখানে নন্দরাজার গৃহে শ্রীবসুদেবের দুই পুত্র বাস করে। তাদের রথে করে এইখানে মথুরায় নিয়ে আসতে হবে। এই কার্যে যেন বিলম্ব না হয়। আমি জানতে পেরেছি যে

বিষ্ণুভক্ত দেবতারা ওই দুইজনকে আমার মৃত্যুর কারণ রূপে স্থির করে রেখেছে। তাই আপনি ওই দুইজনকে এইখানে এনে ফেলুন। আর নন্দ আদি যাদবদের বলবেন যে ধনুর্যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধ, দধি, মাখন দরকার হবে, তা যেন তারা নিয়ে আসে।

এইবার কৃষ্ণ-বলরামকে মথুরায় আনবার কারণটা আপনাকে বলেই দিই। তারা এইখানে এলেই আমি করাল কালসম মদমত্ত কুবলয়পীড় হাতি দিয়ে তাদের বধ করাব। আর যদি তারা হাতির হাত থেকে বেঁচেও যায় তাহলে আমার প্রচণ্ড শক্তিধর মল্লবীর চাণূর ও মুষ্টিক তো তাদের মেরে ফেলবেই। তারা মারা গেলে বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হ বংশের আত্মীয় স্বজন শোকাকুল হয়ে পড়বে তখন আমি তাদের নিজের হাতে বধ করব। আমার বাবা উগ্রসেনের এই বৃদ্ধ বয়সেও রাজ্যলোভ গেল না। তাকে, জ্যেষ্ঠতাত দেবক সহ যারা এখনও আমার শত্রু, তাদের আমি হত্যা করে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ করব। আপনাকেও আমি যথাযোগ্য সম্মান দেবো। কৃষ্ণ-বলরাম তো এখনও শিশু তাই তাদের বধ করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। নিমন্ত্রণ করবার সময়ে বলবেন যে ধনুর্যজ্ঞ দর্শন ও যদুবংশের রাজধানী মথুরার শোভা দেখবার জন্য তাদের মাতুল ডেকে পাঠিয়েছেন।

শ্রীঅক্রূর বস্তুত শ্রীভগবানের মহাভক্ত। তিনি উত্তর দিলেন—মহারাজ ! লাভ-ক্ষতির বিচার করে কাজ নেই কারণ প্রারব্ধ অনুসারে ফললাভ হয়। আপনার আদেশ আমি অবশ্যই পালন করব।

ওদিকে কেশী দৈত্য মনসম দ্রুতগতি ঘোটক রূপে ব্রজে ছুটে এল। তার বিশাল দেহকে কৃষ্ণবর্ণ মেঘ মনে হোত। সে প্রভু কংসের হিতাকাঙ্ক্ষায় শ্রীভগবানকে বধ করবার জন্য সিংহ সম গর্জন করে তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘোটক পিছনের পা দিয়ে আঘাত করতে চাইল। শ্রীভগবান সরে গিয়ে তার পা দুটো ধরে ফেললেন আর ঘুরিয়ে চার শত হাত দূরে নিক্ষেপ করলেন। কেশী আবার মুখ হাঁ করে তেড়ে আসাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বাম হস্ত তার মুখে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ক্ষণিকের জন্য সেই অতিশয় কোমল

করযুগল তপ্ত লৌহসম হয়ে গেল আর তা আকারে বড় হতে লাগল। কেশী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ছটফট করতে করতে মারা পড়ল। কংসের প্রথম আক্রমণ এইভাবে সহজেই প্রতিহত হল।

দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রীভগবান জানতে পারলেন যে লীলাক্ষেত্র মথুরা প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। অন্তর্যামী শ্রীভগবানের কাছে কংসের পরিকল্পনা পরিষ্কার হয়ে গেল। আগামী দিনের লীলাদ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে দেখে সচ্চিদানন্দ নন্দনন্দন আনন্দিত হলেন।

মহামতি শ্রীঅক্রূরও রথারূঢ় হয়ে নন্দবাবার গোকুল উদ্দেশ্যে পরের দিন প্রাতঃকালেই যাত্রা করলেন। জাগতিক সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য হলেও তিনি কমলনয়ন শ্রীভগবানের পরম ভক্ত। গমন কালে তাঁর মনের অবস্থা কেমন ছিল ভক্ত অবশ্য তা জানতে চায়। তিনি ভাবছিলেন :

কিং ময়াহঽচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্॥

(১০।৩৮।৩)

আমি এমন কী শুভ কার্য করেছি, এমন কোন শ্রেষ্ঠ তপস্যা করেছি অথবা কোনো মহাভক্তকে এমন কোন মহৎ দান করেছি যে আমি আজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করব !

কংস ভেবেছিল যে ছলনা করে সে এক যদুবংশের কাঁটাকে বশীভূত করে আর একটি কাঁটা তোলবার কাজে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছে। বস্তুত সে শ্রীঅক্রূরের মহা উপকারই করেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার আশায় শত অন্যায় স্বীকার করে মথুরায় বাস করা সত্যই কষ্টকর ছিল। শ্রীভগবান যে স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন মহাভক্ত অক্রূর তা জানতেন আর শত্রু কংস সেই শ্রীভগবানকে নিজ বিনাশের জন্য মথুরায় ডেকে আনতে চায় আর সেই পরব্রহ্ম পরমেশ্বরকে তাঁর লীলা সম্পাদনের জন্য মথুরা আগমনের জন্য তিনি নিযুক্ত হওয়ায় তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর সকল অশুভ হরণ হয়ে গিয়েছে। সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত আজ সমাগত যখন তিনি শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করে

ধন্য হবেন। যে শ্রীপাদপদ্ম মুনিঋষিদের সর্বকালের ধ্যানের বিষয় তাতে সাক্ষাৎ প্রণাম নিবেদন করা যে মানব কুলে জন্মগ্রহণ করবার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করা। অতএব কংসের দেওয়া হলাহল মহাভক্তের সংস্পর্শে এসে সুধায় পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি ভাবছিলেন :

**অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুযো ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।**
**লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং মহ্যং ন ন স্যাৎফলমঞ্জসা দৃশঃ॥**

(১০।৩৮।১০)

ভগবান শ্রীবিষ্ণু ভূভার হরণের জন্য স্বেচ্ছায় নরলীলা সম্পাদন করছেন। তিনি সম্পূর্ণ লাবণ্য নিকেতন ; সৌন্দর্যের মূর্তিমান বিগ্রহ। আজ আমি তাঁরই দর্শন লাভ করব ! অবশ্যই করব ! দর্শন করে চক্ষু সার্থক করব।

তাঁর মনে এই সন্দেহও উঁকি মেরেছে— 'আমি কংসের দূত হয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি আমাকে শত্রুপক্ষ মনে করবেন না তো ?' তিনি নিজেই আবার তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন— 'তিনি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করে অন্তঃকরণের প্রতি চেষ্টাকে নিজ নির্মল জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করে থাকেন। তাই তেমন ভাববার কোনও কারণ নেই।'

শ্বফল্কনন্দন অক্রূর পথে ভগবদ্ভক্তিতে ভাসতে ভাসতে যখন গোকুলে উপনীত হলেন তখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার পথে। যাঁর শ্রীপাদপদ্মরজ লোকপালগণ নিজ কিরীট দ্বারা স্পর্শ করেন শ্রীঅক্রূর গোষ্ঠে প্রবেশের মুখে তার চরণচিহ্ন দর্শন করলেন। কমল, অঙ্কুশ, বজ্র, যব আদি অসাধারণ চিহ্নসকল সেই পরিচয় দিচ্ছিল। তা পৃথিবীকে যেন শোভমান করে রেখেছিল। শ্রীভগবানের চরণ চিহ্ন দর্শন করেই শ্রীঅক্রূরের অন্তরে এত আহ্লাদ হল যে তিনি নিজেকে আর সামলে রাখতে পারলেন না ; বিহ্বল চিত্ত হয়ে পড়লেন।

**তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ প্রেম্ণোর্ধ্বরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।**
**রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি॥**

(১০।৩৮।২৬)

সেই চরণচিহ্নসকল দর্শন করতেই শ্রীঅক্রূরের অন্তরে এত আহ্লাদ হল যে তিনি আত্মহারা ও বিহ্বলচিত্ত হয়ে পড়লেন। প্রেমাবেগে তাঁর তনুতে রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ হল ; প্রেমাবেগ বিহ্বল হয়ে অশ্রুধারারূপে ভূমিতে পড়ে মুখ লুকাবার চেষ্টা করল। শ্রীপ্রভুর পদরজ অঙ্গে ধারণ করবার জন্য তিনি রথ থেকে নেমে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। পরম ভক্ত যেন নিজ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন—দম্ভ, ভয় ও শোক ত্যাগ করে শ্রীভগবানের মূর্তি (প্রতিমা, ভক্ত আদি) চিহ্ন, লীলা, স্থান ও মহিমা দর্শন-শ্রবণ আদির দ্বারা এমন সব ভাব সম্পাদন করা প্রয়োজন হয়ে থাকে।

এরপর শ্রীঅক্রূর যখন গোশালায় পৌঁছালেন তখন তাঁর পরব্রহ্ম পরমেশ্বর দর্শন লাভ হল :

**দদর্শ কৃষ্ণং রামং চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।**
**পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ॥**

(১০।৩৮।২৮)

শ্রীঅক্রূর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে গোদোহন স্থানে দর্শন করলেন। শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ পীতাম্বর ও গৌরসুন্দর শ্রীবলরাম নীলাম্বর ধারণ করে শোভমান ছিলেন। তাঁদের নয়ন সৌন্দর্য ছিল শারদ প্রস্ফুটিত কমল সম সুন্দর। গৌর-শ্যামবর্ণ শিথিল সৌন্দর্যের আকর ভ্রাতাদ্বয় তখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন। তাঁরা উভয়ই আজানুলম্বিত বাহু প্রসন্নদর্শন ও সুমনোহর। তাদের সুললিত গতিময়তায় গজেন্দ্রগমনের অনুপম সৌন্দর্য ও লালিত্য ছিল। তাঁদের চরণ তলে ছিল ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও কমল চিহ্ন যাতে তা ধরণীর বুকে, গমনাগমন কালে চিহ্নিত হয়ে যেত আর তা পরম সম্পদরূপে শোভমান থাকত। তাঁদের মুখে ছিল স্মিত হাসি আর দৃষ্টিতে ছিল কৃপা বিতরণের সুষমা। তাঁদের প্রতিটি লীলা যেন উদারতায় প্রকৃষ্ট উদাহরণ ও তা সৌন্দর্যে সদ্য প্রস্ফুটিত কমলকেও হারমানায়। তাঁদের কণ্ঠে ছিল বনমালা ও রত্নহারের দ্যুতি। যেন তাঁরা তখনই স্নান করে নির্মল বস্ত্র ধারণ করে এসেছেন আর তাঁদের অঙ্গ অঙ্গরাগ ও চন্দন চর্চিত।

শ্রীঅক্রূর তখন দেখলেন যে জগতের আদি কারণ, জগৎপতি পুরুষোত্তমই জগৎকে রক্ষা করবার জন্য নিজ সম্পূর্ণ অংশে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়ে নিজ অঙ্গকান্তি দ্বারা দিগ্‌দিগন্তের অন্ধকার দূর করছেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাঁরা সুবর্ণমণ্ডিত মরকতমণি আর রজত শুভ্র পর্বত সম জ্যোতির্ময়। তাঁদের দর্শন করেই শ্রীঅক্রূর প্রেমাবেগে বিহ্বল হয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদন করলেন। বিহ্বলতা হেতু তিনি নিজের নাম পর্যন্ত বলতে সক্ষম হলেন না। শরণাগতবৎসল অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তো কিছুই অজানা ছিল না। তিনি প্রসন্ন চিত্তে চক্রাঙ্কিত হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করে তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। অতঃপর যখন তিনি পরম মনস্বী শ্রীবলরামের সম্মুখে সবিনয়ে দাঁড়ালেন তখন তিনিও আলিঙ্গন দান করলেন। ভক্তকে এক দিকে শ্রীকৃষ্ণ অন্য দিকে শ্রীবলরামকে ধারণ করে গৃহে নিয়ে এলেন। ভক্ত অক্রূর, কংসের আদেশে কৃষ্ণ-বলরামকে বধ করবার জন্য মথুরায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন জেনে অন্তর্যামী শরণাগতবৎসল ভগবান শ্রীকষ্ণ ভক্তকে কাছে টেনে নিচ্ছেন দেখে এটাই বোঝা উচিত যে স্বয়ং ভগবান যে রূপেই থাকুন, কংস আর তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আত্মীয় হিসেবে শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণর পিতৃব্য, গুরুজন। তাই যথোচিত ভাবেই অতিথি সেবা সম্পূর্ণ হল।

শ্রীবলরাম শ্রীঅক্রূরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে উত্তম আসন দান করলেন আর যথাবিধি পাদপ্রক্ষালন করে মধুপর্ক আদি পূজা সামগ্রী দান করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতিথিকে গোদান করে পদসেবা করে তাঁর পথের পরিশ্রম হরণ করলেন আর পরম শ্রদ্ধা সহকারে পবিত্র ও বহুগুণসম্পন্ন অন্নভোজ নিবেদন করলেন। আহারান্তে ধর্মের পরম মর্মজ্ঞ ভগবান শ্রীবলরাম প্রীতিপূর্বক তাম্বূল, পুষ্পমাল্য আদি দান করে ভক্তের উপর মায়ার প্রভাব বিস্তার করলেন। লীলা সংবর্ধন ও বিশ্বাসের মূল সুদৃঢ় করবার জন্যই বোধহয় সাময়িকভাবে তাঁরা যে শ্রীভগবান স্বয়ং এই বোধ ভক্তের মন থেকে হরণ করে নিলেন।

দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালের আহারের পর শ্রীঅক্রূরের কাছে গমন করে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কংসের ব্যবহার আর তাঁর ইচ্ছা সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে বললেন—হে পিতৃব্য ! কংস আমাদের নামেই কেবল মাতুল ; বস্তুত সে আমাদের কুলের এক ভয়ংকর ব্যাধিস্বরূপ। সে যতদিন শাসন করবে আমাদের মঙ্গল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভাবতে কষ্ট হয় যে আমার জন্য আমার নিরপরাধ জনক-জননীকে কত ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে। আমার জন্য তাঁদের সন্তানদেরও হারাতে হয়েছে। আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আমার ইচ্ছা করছিল। আমি অতি সৌভাগ্যবান যে আমার সেই অভিলাষ আজ পূর্ণ হল। হে পিতৃব্য ! দয়া করে বলুন যে আপনার শুভাগমনের নিমিত্ত কী ?

অন্তর্যামী শ্রীভগবান সব কথাই জানতেন তবুও তা ভক্তর মুখ থেকে শুনতে চাইলেন। শ্রীঅক্রূর তখন উত্তর দিয়ে বললেন— কংস যদুবংশের সকলকে ধ্বংস করবার জন্য তৎপর হয়েছে। সে তো মহামতি শ্রীবসুদেবকেও হত্যা করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অতঃপর ভক্ত শ্রীঅক্রূর কংসর বার্তা, তাঁকে দূতরূপে প্রেরণ করবার প্রকৃত উদ্দেশ্য, দেবর্ষি নারদের গোপন কথাগুলি কংসর কাছে ফাঁস করে দেওয়া—সকল বৃত্তান্তই সবিস্তারে শ্রীভগবানকে নিবেদন করলেন। ভক্তমুখে, জানা কথাগুলিই শ্রবণ করে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম হাসলেন। এইবার তাঁরাই মহারাজ কংসের আদেশ পিতা নন্দরাজকে জানালেন। শ্রীনন্দ গোপদের আদেশ দিলেন— মহারাজ কংস ধনুর্যজ্ঞ করবেন যাতে দুগ্ধজাত সামগ্রী প্রয়োজন। সকলে এখনই এই উপহার সংগ্রহে যুক্ত হও এবং এগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য গোযানও প্রস্তুত কর। আগামীকাল প্রাতঃকালেই আমরা মথুরা উদ্দেশ্যে যাত্রা করে মহারাজকে ওই সকল দ্রব্যাদি উপহার দেবো ; আমরাও সেই ধনুর্যজ্ঞ দেখব। এই সংবাদ নগরে সর্বত্র ঘোষিত হল।

এইভাবে শ্রীভগবানের মথুরা গমনের সংবাদ গোপীগণ শ্রবণ করে

চমকে উঠলেন। শ্রীঅক্রূর মনোমোহন শ্যামসুন্দর ও গৌরসুন্দর শ্রীবলরামকে মথুরায় নিয়ে যাওয়া জন্য ব্রজভূমিতে এসেছেন জেনে গোপীগণ দুঃখ-কষ্টে যেন ভেঙে পড়লেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরা চলে যাবেন—এই বার্তা শ্রবণ করে তাঁদের অনেকের অন্তরে বিরহ প্রদাহ শুরু হয়ে গেল। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে তাঁদের মুখশ্রী ম্লান হয়ে পড়ল। বহু গোপীগণের এমন দশা হল যে বসন, বলয় ও কেশ গ্রন্থিসকল যে স্খলিত হয়ে যাচ্ছে সে বোধও রইল না। বহু গোপীর শ্রীভগবানের স্বরূপ মনে পড়ে যেতেই, চিত্তবৃত্তি সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়ে গেল ; তাঁরা যেন সমাধিস্থ– আত্মায় স্থিত হয়ে গেলেন। তাঁদের তখন নিজ দেহ ও জগতের বোধই রইল না। বহু গোপীদের সম্মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম, মুচকি হাসি আর হৃদয়স্পর্শী বিচিত্র পদ সমৃদ্ধ সুমধুর বাণী যেন নৃত্যশীল হয়ে উঠল। তাঁরা তাতে মোহিত হয়ে মগ্ন হয়ে গেলেন। গোপীগণ মনে মনে শ্রীভগবানের সুললিত বিচরণ, সুস্নিগ্ধ সহাস্য দৃষ্টিবিক্ষেপ, সর্বশোক বিনাশন পরিহাসবাক্য আর প্রশস্তচিত্ত লীলাসকল রোমন্থন করতে লাগলেন আর তাঁর বিরহ ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁদের অন্তর, এমনকী প্রাণ পর্যন্ত সব কিছু শ্রীভগবানের চরণে সমর্পিত ছিল। তাঁদের নয়ন সজল হয়ে উঠেছিল। তাঁরা একজোট হয়ে বলতে লাগলেন—ও বিধাতা ! তুমি বিধাতা হয়েও এত নির্দয় কেন ? তুমি সৌহার্দ্য ও প্রীতি দান করে জগতের জীবদের কাছাকাছি এনে দাও কিন্তু আশা ও তৃপ্তি লাভের পূর্বেই আবার তাদের অকারণে আলাদা করে দাও। এ তোমার কেমন বালকোচিত খেলা !

**যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।**
**শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্॥**

(১০।৩৯।২০)

হে বিধাতা ! এ কেমন ব্যবহার ! তুমি প্রথমে আমাদের প্রেমময় শ্যামসুন্দরের সুন্দর মুখারবিন্দ দেখালে ! কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশদামের কপোলে কী অনুপম সৌন্দর্য ! মরকত মণিসম চিক্কণ সুস্নিগ্ধ কপোল ও

শুকচঞ্চুসম সুন্দর নাসিকা আর অধরে মৃদুমন্দ মুচকি হাসি ! যা সকল শোক মুহূর্তে হরণ করে। হে বিধাতা ! একবার তুমি আমাদের সেই অনিন্দসুন্দর শ্রীমুখ দেখালে আর তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছ। তোমার এই কার্য সর্বতোভাবে নিন্দনীয়।

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের উপর দোষারোপ করে বলতে লাগলেন—আমরা তো তোমার জন্য ঘরসংসার, আত্মীয়স্বজন, পতি-পুত্র সব কিছু ছেড়ে এসেছি আর তোমার দাসীরূপে সেবা করছি। যদিও আজ আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তবু তুমি নিস্পৃহ কেন ? মথুরার রমণীকুল শত সৌভাগ্যবতী ! যখন আমাদের ব্রজরাজ শ্যামসুন্দর নিজ কটাক্ষপাত ও মৃদুমন্দ হাস্যযুক্ত মুখপদ্মের মাদক মধু বিতরণ করতে করতে আগামীকাল মথুরাপুরীতে প্রবেশ করবেন, তখন তারা তা পান করে ধন্য হয়ে যাবে। এই ব্রজভূমিতে তো তাও নন্দরাজা আদি গুরুজন আছেন কিন্তু মথুরায় তো কেউ নেই। তাই মথুরার যুবতীগণ তাদের সুমধুর কথায় শ্যামসুন্দরের চিত্ত হরণ করে নিতে সক্ষম হবে। মথুরার দশার্হ, ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণীবংশের যাদবগণ তাঁর দর্শনলাভ করে ধন্য হয়ে যাবেন। তখন আমরা এই ব্রজভূমিতে কেমন করে বাস করব ? নাম তাঁর অক্রূর অথচ আচরণ ক্রূর সম। আমাদের মতন অবলা নারীদের দুঃখ সন্তাপের কথা আদৌ গ্রাহ্য না করে তিনি আমাদেরই প্রাণপ্রিয়কে কেড়ে নিয়ে মথুরায় চলে যাচ্ছেন ! কী নিষ্ঠুর আচরণ ! গোপীগণের মুখে এমন কথা বললেও তাঁদের প্রতিটা উক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করছিল ও তাঁকে আলিঙ্গন করছিল। বিরহ ব্যাকুল গোপীগণ লজ্জাদি পাশ ত্যাগ করে প্রিয়তমের জন্য হে গোবিন্দ ! হে দামোদর ! হে মাধব ! রক্ষা কর বলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে থাকলেন। রাত্রি এই ভাবেই কেটে গেল আর সেই সূর্যোদয় তাঁদের প্রত্যক্ষ করতে হল, যেদিন তাঁরা প্রিয়তমকে হারাতে চলেছিলেন।

**অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো রথং তমন্বয়ী চ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ।**
**গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং দৈবঞ্চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে॥**

(১০।৩৯।২৭)

ও সখি ! দেখ, আমাদের এই শ্যামসুন্দরও কম নিষ্ঠুর নন। দেখ, তিনি কেমন নির্বিকার চিত্তে রথে উঠে বসলেন আর গোপগণও বা কেমন ! তারা গোযানে যাওয়ার জন্য আকুলি বিকুলি করছে। তারা তো মহামূর্খ । গুরুজনদের দেখ। তাঁরা কিছুই বলছেন না। এখন আমরা কী করি ? আজ বিধাতা দেখছি সর্বতোভাবে আমাদের প্রতিকূল। শ্যামসুন্দরকে ব্রজে ধরে রাখবার জন্য গোপীগণ রথকেও অবরুদ্ধ করবার কথা ভাবলেন। কারণ ভক্ত শ্রীভগবানের সঙ্গ লাভ না করে কেমন করে থাকবে ?

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে গোপীদের কথা জানতেন না তা নয় কিন্তু লীলা প্রয়োজনে মথুরায় যাওয়া যে একান্ত প্রয়োজন। গোপীদের অন্তর্দাহ প্রশমনে তিনি দূত দ্বারা 'আমি আসব' বার্তা ভক্তদের পৌঁছে দিলেন। শ্রীভগবানের স্মৃতি ও প্রীতি ব্রজভূমিতে রেখে অক্রূর মথুরা অভিমুখে রথ চালনা করলেন। যতক্ষণ রথের ধ্বজা ও রথচক্রের ধূলি উড়তে দেখা গিয়েছিল, গোপীগণ আশা রেখেছিলেন যে তাঁদের প্রাণবল্লভ ফিরে আসবেন।

শ্রীঅক্রূরের রথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে নিয়ে বায়ুসম গতিতে পাপবিনাশন শ্রীযমুনার তীরে উপনীত হল। শ্রীভগবানের মথুরা লীলায় প্রবেশ নিশ্চিত হল। বিদ্বজ্জনের মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পালন করেছিলেন। লীলা সমাপনে তিনি বৈকুণ্ঠে ফিরে না গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে প্রবেশ করে গোপীদের সঙ্গদান করেছিলেন। গোপীদের সঙ্গে একবার অবশ্যই তার মধ্যে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে সমবেত হওয়ার সময়ে তিনি মিলিত হয়েছিলেন যখন তিনি তাঁদের জ্ঞানোপদেশ দানও করেছিলেন। এই আপাত-সরল লীলারহস্য যে বুঝতে পারা খুবই কঠিন !

———o———

# বৈকুণ্ঠনাথ

শ্রীহরি মথুরালীলা আরম্ভ করবার জন্য তাঁর বাল্যলীলাস্থল ছেড়ে ভক্ত অক্রূরের রথে চড়ে নিস্পৃহ ভাবে চলেছেন। শ্রীহরি সর্বত্র বিরাজমান তাই তাঁর জন্য ছেড়ে যাওয়া কথাটা বোধহয় ব্যবহার করা অনুচিত। পথশ্রম লাঘব করবার জন্য বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। তাই রথ যমুনার তীরে দাঁড়াতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম রথ থেকে নেমে নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে অমৃতসম মরকতমণিনীল সুমিষ্ট পাপনাশিনী যমুনার জল পান করলেন আর বৃক্ষরাজির তলায় রাখা রথে আবার উঠে বসলেন। শ্রীঅক্রূর রথ চালনা করে ক্লান্ত হয়ে ছিলেন তাই তিনি শ্রীভগবানের অনুমতি নিয়ে কালিন্দী কুণ্ডে স্নানপর্ব সমাধা করে (অনন্ত তীর্থে অথবা ব্রহ্ম হ্রদে) জলমগ্ন হয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

জলে নিমগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম জলের ভিতরেও রয়েছেন। তিনি ভাবলেন :

**তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ।**
**তর্হি স্বিৎ স্যন্দনে ন স্ত ইত্যুন্মজ্জ্য ব্যচষ্ট সরঃ॥**

(১০।৩৯।৪২)

তখন তাঁর মনে উৎকণ্ঠা হল —'শ্রীবসুদেব পুত্রদ্বয়কে তো আমি (এইমাত্র) রথে বসিয়ে এলাম, তাঁরা এইখানে জলে এলেন কেমন করে ? যদি তারা এইখানে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই রথের উপর বসে নেই।' এই মনে করে তিনি জল থেকে মাথা বার করে যমুনার পাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

শ্রীঅক্রূর শ্রীভগবানের মহাভক্ত কিন্তু তিনি তাঁকে সাকাররূপেই জানেন। শ্রীভগবান যে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত পরব্রহ্ম, নিরাকার ও সাকার—দুইই, এই বোধ তখনও তাঁর ছিল না। তাই জল থেকে মাথা তুলে তাকাতেই তিনি যখন সেই যুগল মূর্তিকে রথে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলেন তখন তিনি বিভ্রান্ত

হয়ে পড়লেন। শ্রীভগবান তো অহেতুক কৃপাসিন্ধু, তাই মথুরালীলার সহায়ক মহাভক্তকে তিনি কৃপা করছেন। এবার অক্রূর সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্য যমুনার জলে আবার নিমগ্ন। এইবার যে দৃশ্য তিনি দেখলেন তা দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা ভক্তকুলের পরম সৌভাগ্য হলে তবেই পূর্ণ হয়ে থাকে। তিনি বৈকুণ্ঠ ধামের দর্শন পেলেন। সেইখানে নাগরাজ অনন্তদেব সহস্র মস্তকে কিরীট ধারণ করে বিরাজমান ছিলেন আর সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব ও অসুর অনবত মস্তকে তাঁর স্তুতি করছিলেন। শ্রীশেষনাগ মৃণালভুজসম শ্বেত শুভ্র অঙ্গে নীলাম্বর ধারণ করে ছিলেন আর সহস্র শৃঙ্গ কৈলাস পর্বত সম বিরাজমান ছিলেন। নাগরাজ অনন্তদেবের অঙ্গে আর এক আশ্চর্য দৃশ্য ছিল।

**তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসম্।**
**পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্॥**

(১০।৩৯।৪৬)

এ যে নবনীরদকান্তি শ্যামসুন্দর স্বয়ং বিরাজমান। অঙ্গে তাঁর কৌষেয় পীতাম্বর। তিনি শান্ত চতুর্ভুজ মূর্তি। পরমপুরুষ ঘনশ্যাম পদ্মপত্রদলসম অরুণাভলোচন।

তাঁর মুখমণ্ডল সুমনোহর ; যেন প্রসন্নতার আকর, সুমধুর স্মিতহাস্য ও চারু দৃষ্টিনিক্ষেপ ; শ্রবণ ও কপোলদেশ চিত্ত হরণ করে। ভ্রূযুগল সুন্দর ও উন্নত নাসিকায় যেন সকল সৌন্দর্যের অবস্থান। অনুপম কান্তিযুক্ত তাঁর অরুণাভ ওষ্ঠপুট। তাঁর সুডৌল শক্তিসম্পন্ন বাহুসকল আজানুলম্বিত। তিনি সিংহস্কন্ধ। তাঁর বক্ষঃস্থল দেবীলক্ষ্মীর আশ্রয়স্থল। তিনি কম্বুকণ্ঠ, নিম্ননাভি ও অশ্বত্থপত্রসম ত্রিবলিযুক্ত শোভমান উদরযুক্ত। তাঁর কটিতট ও নিতম্ব বিশাল। তিনি কুঞ্জরাস্য জঙ্ঘা ও রমণীয় জানু, উন্নত গুল্ফ। তার অরুণাভ নখ সকল থেকে দিব্য জ্যোতির্ময় আভা বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে। পদপ্রান্তের অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠে নব কোমল পদ্মদলের সৌন্দর্য। তাঁর কিরীট অমূল্য মণিমুক্তাখচিত। তিনি বলয়, অঙ্গদ, চন্দ্রহার, মুক্তাহার, নূপুর, কুণ্ডল ও

যজ্ঞোপবীত শোভিত। হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করে আছেন। তাঁর বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি ও বনমালা দোদুল্যমান যার শোভা অনুপম।

নির্মল চিত্ত নন্দ-সুনন্দ আদি পার্ষদগণ, সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, ব্রহ্মা, মহাদেব আদি মুখ্য দেবতাগণ। মরীচি আদি নব ব্রাহ্মণ প্রজাপতিগণ আর প্রহ্লাদ, নারদাদি শ্রীভগবানের পরম প্রিয় ভক্তগণ, অষ্ট বসু আদি সকলেই নিজ নিজ ভাবে বেদবাণী দ্বারা তাঁর স্তুতি করছেন। সঙ্গে শ্রী, পুষ্টি, সরস্বতী, কান্তি, কীর্তি ও তুষ্টি আদি শক্তি ও মায়া তাঁর সেবা করছেন।

এই দৃশ্য দেখে মহাভক্ত অক্রূরের অন্তর পরমানন্দে পরিপূর্ণ হল। তিনি পরম ভক্তি লাভ করেছিলেন। আনন্দে তাঁর অঙ্গে পুলক শিহরণ দেখা গেল ও নয়নযুগল অশ্রুসজল হয়ে উঠল। এইবার শ্রীঅক্রূর সাহস করে শ্রীভগবানের চরণে মস্তক রেখে প্রণাম করলেন। পিতৃব্য তখন শ্রীভগবানের মহাভক্ত। তিনি হাত জোড় করে গদগদ স্বরে শ্রীভগবানের স্তুতি করতে লাগলেন।

হে প্রভু ! আপনি প্রকৃতি আদি সকল কারণের পরম কারণ। আপনিই অবিনাশী পুরুষোত্তম নারায়ণ। যে ব্রহ্মা বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছেন তিনি আপনার নাভিকমল সম্ভূত। আমি আপনার চরণে প্রণাম করি।

সাধু যোগী স্বয়ং নিজ অন্তঃকরণে স্থিত অন্তর্যামীরূপে, সমস্ত জাগতিক পদার্থে ব্যাপ্ত পরমাত্মারূপে আর সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি আদি দেবমণ্ডলে স্থিত ইষ্টদেবতা রূপে আর তার সাক্ষী মহাপুরুষ ও নিয়ন্তা ঈশ্বর রূপে সাক্ষাৎ আপনারই উপাসনা করে থাকেন।

হে প্রভু ! যারা অন্য দেবতাদের ভক্তি করেন আর তাঁদের আপনার থেকে পৃথক বুদ্ধি রাখেন তারা বস্তুত আপনারই আরাধনা করে থাকেন কারণ আপনিই সমস্ত দেবতারূপে ও সর্বেশ্বররূপেও বিরাজ করেন।

আপনার প্রকৃতিতে যে সত্ত্ব, রজ, তম, গুণ দেখা যায় তা ব্রহ্মা থেকে স্থাবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্ব চরাচরে বস্ত্রে তন্তুসম মিলেমিশে আছে।

**নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।**
**হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে॥**

(১০।৪০।১৭)

হে প্রভু! আপনি বেদ, ঋষি, ঔষধি ও সত্যব্রত আদির সংরক্ষণের জন্য মৎস্যরূপ ধারণ করেছিলেন আর প্রলয় সাগরে স্বচ্ছন্দে বিহার করেছিলেন। আমি আপনার মৎস্যরূপকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনিই মধু ও কৈটভ নামক অসুরদের সংহার করবার জন্য হয়গ্রীব অবতার রূপ গ্রহণ করেছিলেন। আমি আপনার সেই রূপকেও প্রণাম জানাই।

**অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।**
**ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ সূকরমূর্তয়ে॥**

(১০।৪০।১৮)

আপনিই সেই বিশাল কূর্মরূপ গ্রহণ করে মন্দার পর্বতকে ধারণ করেছিলেন। আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনিই পৃথিবীকে উদ্ধার করবার লীলায় বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন। আপনাকে আমার বারে বারে প্রণাম জানাই।

**নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোকভয়াপহ।**
**বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ॥**

(১০।৪০।১৯)

প্রহ্লাদসম সাধুজনদের ভীতি নিবারণকারী প্রভু! আপনার সেই অলৌকিক নৃসিংহরূপকে আমার প্রণাম। আপনি বামনরূপ ধারণ করে তিন পায়ে ত্রিলোক অধিকার করেছিলেন। আমি আপনাকে সতত স্মরণ করি।

**নমো ভৃগুণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবনচ্ছিদে।**
**নমস্তে রঘুবর্যায় রাবণান্তকরায় চ॥**

(১০।৪০।২০)

ধর্ম অগ্রাহ্যকারী অহংকারী ক্ষত্রিয়বন (অরণ্য) ছেদন করবার জন্য আপনি ভৃগুপতি পরশুরাম রূপ গ্রহণ করেছিলেন। আমি আপনার সেই

রূপকেও প্রণাম করি। রাবণকে বিনাশ করবার জন্য আপনি রঘুবংশে ভগবান রামরূপে অবতার গ্রহণ করেছিলেন। আমি আপনাকে সর্বান্তকরণে প্রণাম নিবেদন করছি।

**নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।**
**প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥**

(১০।৪০।২১)

বিষ্ণুভক্ত ও যদুবংশকে প্রতিপালন করবার জন্য আপনিই নিজেকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ — এই চতুর্ব্যূহের রূপে প্রকাশ করেছেন। আমি আপনাকে বারে বারে প্রণাম করি।

**নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে।**
**ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে॥**

(১০।৪০।২২)

দৈত্য ও দানবদের মোহিত করবার জন্য আপনি শুদ্ধ অহিংসা পথ প্রবর্তক বুদ্ধরূপ গ্রহণ করবেন। আমি আপনাকে নমস্কার করি। পৃথিবীর ক্ষত্রিয় কুল যখন ম্লেচ্ছসম হয়ে যাবে তখন তাদের বিনাশের জন্য আপনিই কল্কিরূপে অবতরণ করবেন। সেই আপনাকে বার বার প্রণাম।

ভগবন্ ! জীব সকল আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে 'আমি ও আমার' দুষ্টচক্রে বদ্ধ হয়ে কর্মপথে ঘুরে মরছে। আমিও স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুসম দেহ- গেহ, পত্নী-পুত্র ও ধনসম্পদ-আত্মীয়স্বজনকে সত্য মনে করে মোহিত হয়ে ঘুরে মরছি। এইভাবে আমি অজ্ঞানতা হেতু সাংসারিক সুখ-দুঃখ আদি দ্বন্দ্বেই মোহিত হয়ে ভুলে গেলাম যে আপনিই আমাদের আপনজন। আমি অবিনশ্বর অক্ষর জ্ঞানশূন্য, তাই আমার মনে কামনা ও তার জন্য কর্ম সম্পাদন করবার সংকল্প সতত উঠতেই থাকে। প্রবল ও দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়-সকল মনকে জোর করে অস্থির করে তোলে ; আমি মনকে সামলাতে সক্ষম হই না। সৌভাগ্যক্রমে আমি আপনার সেই শ্রীপাদপদ্মের ছত্রছায়ায় এসে পড়েছি যা সাধারণত দুষ্ট ব্যক্তির জন্য দুর্লভই হয়ে থাকে। এটি আমি

আপনার পরম কৃপা মনে করি। আপনার শক্তি অনন্ত। আপনি পরব্রহ্ম স্বয়ং। আমি আপনাকে নমস্কার করি।

নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো॥

(১০।৪০।৩০)

হে প্রভু ! আপনিই বাসুদেব, আপনিই সকল জীবের আশ্রয় (সঙ্কর্ষণ) ; আর আপনিই বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হৃষীকেশ (প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ)। আমি আপনাকে বারে বারে প্রণাম করি। হে প্রভু ! আমি শরণাগত আমাকে আপনি রক্ষা করুন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জলে নিজ দিব্যরূপ দর্শন করিয়ে আবার কুশল নটসম তা লুকিয়ে ফেললেন। দিব্যরূপ অন্তর্ধান হয়ে যেতে শ্রীঅক্রূর জল থেকে উঠে এলেন। রথের কাছে আসতে তিনি শুনলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকেই জিজ্ঞাসা করছেন— হে পিতৃব্য ! আপনি ভূমি, আকাশ বা জলে কোনো অদ্ভুত কিছু দেখেছেন কি ? আপনাকে দেখে আমার যেন সেই কথা মনে হচ্ছে।

শ্রীঅক্রূর উত্তর দিলেন— হে প্রভু ! ভূমি, আকাশ বা জলে আর সমগ্র জগতে যত অদ্ভুত বস্তু আছে সব তো আপনার মধ্যেই আছে কারণ আপনিই বিশ্বরূপে পরিব্যাপ্ত। যখন আমি আপনাকেই দেখছি তখন এমন কী অদ্ভুত বস্তু আর কী দেখলাম ?

শ্রীঅক্রূর এইরূপ বলে রথ চালনা আরম্ভ করলেন। দিবাবসানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মথুরায় উপনীত হলেন। মথুরা লীলার শুভারম্ভ হয়ে গেল।

---o---

# কংস বধ

শ্রীভগবানের রথ যখন মথুরার উপকণ্ঠে উপনীত হল তখন অপরাহ্নকাল সমাগত। তাঁদের আগমনের পূর্বেই নন্দবাবা এবং অন্যান্য গোপগণ মহারাজ কংসের ধনুর্যজ্ঞ হেতু প্রয়োজনীয় দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি নিয়ে মথুরার উপকণ্ঠে অবস্থিত উপবনে পুত্রদ্বয়ের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন। ভক্ত অক্রূর তাঁদের নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু মহাভক্তকে মহারাজ কংসের রোষ থেকে রক্ষা করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবিনয়ে পিতৃব্যের হাত ধরে স্মিতহাস্য সহকারে বললেন—পিতৃব্য ! আপনি রথ নিয়ে প্রথমে মথুরায় প্রবেশ করে নিজ গৃহে গমন করুন। কর্তব্যকর্ম সমাধা করে আমি অগ্রজকে নিয়ে আপনার গৃহে অবশ্যই আসব। শ্রীঅক্রূর শ্রীভগবানের আদেশ শিরোধার্য করে মহারাজ কংস সকাশে গমন করে নিবেদন করলেন যে আদেশ অনুসারে কার্য সম্পাদিত হয়েছে ; আর তারপর তিনি স্বগৃহে গমন করলেন।

পর দিন অপরাহ্নে শ্রীবলরাম ও সখাদের নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় প্রবেশ করলেন। অনুপম বৈভবসম্পন্ন মথুরা নগর। স্ফটিকমণি খচিত পুরদ্বার, গৃহে সুবর্ণময় কপাট ও তোরণ, নগরের চারদিকে তামা ও পেতলের প্রাচীর, দুর্গম পরিখা নগরের সৌন্দর্য ও সুরক্ষা ঘোষণা করছিল। গৃহদ্বারে ছিল দধি ও চন্দন আদি দ্বারা চর্চিত জলপূর্ণ মঙ্গলঘট যা পুষ্প, দীপ, ফলযুক্ত কদলী ও সুপারি বৃক্ষ, পতাকা ও কৌষেয় বস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত ছিল।

বসুদেবনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সখাদের নিয়ে রাজপথ দিয়ে মথুরা নগরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের আগমন সংবাদ রমণীকুলের মধ্যে চাঞ্চল্য ও ঔৎসুক্য সৃষ্টি করল। তাঁকে দর্শন করতে ছুটে আসবার সময়ে তাদের হুঁশ ছিল না ; অসম্পূর্ণ সাজসজ্জাতেই তারা ব্যাকুল চিত্তে ছুটে এসেছিল।

শ্রীভগবানকে দর্শন করে তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল :

**উচুঃ পৌরা অএহা গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ।**
**যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ॥**

(১০।৪১।৩১)

ধন্য ! ধন্য ! গোপীরা এমন কোন মহান তপস্যা করেছে যার প্রভাবে তারা জনগণকে পরমানন্দ প্রদানকারী এই দুই মনোহর কিশোরদের নিত্য দর্শন লাভ করে !

এমন সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে এক রজক — যে বস্ত্র ছোপানোর কাজও করত, তাঁদের দিকে আসছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার কাছ থেকে উত্তম বস্ত্র চাইলেন। তিনি বললেন—তুমি আমাদের মাপসই বস্ত্র দাও। আমরা ওই বস্ত্রসকল ধারণ করবার অধিকার রাখি। তাতে তোমার সর্বতোভাবে কল্যাণ হবে। মূর্খ রজক রাজা কংসর সেবকরূপে অহংকারী ছিল। সে বস্ত্রদানে অসম্মত হয়ে শ্রীভগবানকে তিরস্কার করে বসল—তোমরা তো পর্বত অরণ্যবাসী মনে হচ্ছে—তবে এমন বস্ত্র পরতে ইচ্ছা কর কেন ? তোমাদের স্পর্ধা তো কম নয়, রাজার সম্পদ লুণ্ঠন করতে চাও। দূর হও, না হলে কোন রাজকর্মচারীর খপ্পরে পড়লে তোমাদের অশেষ দুর্গতি হবে। শ্রীভগবান কুপিত হয়ে করাঘাত করলে রজকের মস্তক ভূলণ্ঠিত হল। তাই দেখে রজকের সহচরসকল ভয়ে বস্ত্রের পোঁটলা ফেলে পলায়ন করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তখন তাঁদের উপযুক্ত বস্ত্র বার করে পরিধান করলেন আর সখাদেরও দিলেন। অবশিষ্ট বস্ত্র সেইখানেই পড়ে রইল। এইভাবে দেবদ্রোহী রজকের শাস্তি প্রদান হয়ে গেল। পথে এক তন্তুবায়ের সঙ্গে দেখা হল। সে শ্রীভগবানের অনুপম সৌন্দর্য দেখে প্রসন্ন চিত্ত হয়ে গেল। সেই সুন্দর বস্ত্রসকল সে দেহে এমনভাবে সজ্জিত করে দিল যে তাঁদের বেশবাস পরম সুন্দর এবং মনোরম। বহু বস্ত্রে বিভূষিত হয়ে ভ্রাতাযুগল শোভার আধার হয়ে গেলেন ; যেন শ্বেত-শ্যাম গজশাবক দ্বয়কে উৎসব উপলক্ষে সুসজ্জিত করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন প্রসন্ন।

**তস্য প্রসন্নো ভগবান্ প্রাদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ।**
**শ্রিয়ং চ পরমাং লোকে বলৈশ্বর্যস্মৃতীন্দ্রিয়ম্॥**

(১০।৪১।৪২)

প্রসন্ন চিত্ত শ্রীভগবান তন্তুবায়কে ইহলোকে অনুপম ধনসম্পদ, বল-ঐশ্বর্য, নিজ স্মৃতি, দূর দর্শন-দূর শ্রবণ আদি ইন্দ্রিয় শক্তি ও মৃত্যুর পর নিজ সারূপ্য মুক্তিও প্রদান করলেন। শ্রীহরির কৃপা এমনই হয়।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামা মালাকারের গৃহে গমন করলেন। ভ্রাতাদ্বয়কে আসতে দেখে সুদামা দাঁড়িয়ে উঠে তাঁদের অভ্যর্থনা করল আর ভূমিতে মস্তক রেখে প্রণাম নিবেদন করল। অতঃপর তাঁদের আসন দান করে তাঁদের পাদপ্রক্ষালন করল আর হাত ধুয়ে দিল। অতঃপর মালাকার রাখালদের সঙ্গে তাঁদের পুষ্পমাল্য, তাম্বূল ও বন্দনাদি সহিত বিধি অনুসারে পূজা করল। সে প্রার্থনা করে বলল : হে প্রভু ! আপনাদের শুভাগমনে আমার জন্ম সার্থক হল ও আমার কুল পবিত্র হল। আজ আমি পিতৃঋণ, ঋষিগণ ও দেবঋণ থেকে মুক্ত হলাম। স্তুতি করে সে বলল :

**তাবাজ্ঞাপয়তং ভৃত্যং কিমহং করবাণি বাম্।**
**পুংসোঽত্যনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে॥**

(১০।৪১।৪৮)

আমি আপনাদের সেবক। আপনার সেবা করবার জন্য আদেশ দিন। ভগবন্ ! আপনাদের আদেশ লাভ করে কিছু সেবা করতে পারলে এই জীব কৃতার্থ হবে।

সুদামা মালাকর শ্রীভগবানের অভিপ্রায় জানতে পেরে প্রীতি সহকারে পরম সুন্দর সুগন্ধিত পুষ্পের অনুপম মাল্য প্রস্তুত করে তাঁদের সুসজ্জিত করে দিল। সখাগণও মাল্যভূষিত হল। প্রসন্নচিত্ত শ্রীভগবান বর দান করতে চাইলে সুদামা তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অবিচল ভক্তি প্রার্থনা করল আর তাঁর ভক্তদের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও মৈত্রীর সম্বন্ধ ও দয়া ভাব প্রার্থনা করল।

**ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা শ্রিয়ং চান্বয়বর্ধিনীম্।**
**বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম সহাগ্রজঃ॥**

(১০।৪১।৫২)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে তার কাঙ্ক্ষিত বর দিয়ে এমন শ্রী দিলেন যা বংশপরম্পরায় বৃদ্ধি পাবে ; আর সঙ্গে বল, আয়ু, কীর্তি ও কান্তিও প্রদান করলেন।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দলবল নিয়ে রাজপথে গমন কালে এক যুবতী রমণীকে দেখলেন। রমণী সুন্দর মুখশ্রী যুক্ত হয়েও কুব্জা ; সে হাতে চন্দন পাত্র নিয়ে যাচ্ছিল। প্রেমরসদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই কুব্জার উপর কৃপা করবার জন্য হেসে বললেন—হে সুন্দরী । তুমি কে ? এই চন্দন কার জন্য নিয়ে যাচ্ছ ? হে কল্যাণী ! আমাকে কিছু লুকিয়ো না। এই উত্তম চন্দন ও অঙ্গরাগ আমাদেরও দাও। দান করলে এখনই তোমার পরম কল্যাণ হবে।

উত্তরে কুব্জা সৈরন্ধ্রী বলল—হে পরমসুন্দর ! আমি কংসের প্রিয় দাসী। আমার গ্রীবা, বক্ষঃ ও কটিদেশ বঙ্কিম বলে আমাকে লোকে ত্রিবক্রা (কুব্জা) বলে। আমি কংসের চন্দন অঙ্গরাগ প্রলেপনের কার্য করি। ভোজরাজ কংস আমার প্রস্তুত করা চন্দন ও অঙ্গরাগ ভালোবাসেন। কিন্তু আপনাদের দুই জনকে দেখে মনে হচ্ছে যে অনুলেপনের জন্য আপনাদের মতন উপযুক্ত পাত্র অন্য কেউই নয়। শ্রীভগবানের সৌন্দর্য, সুকুমার তনু, রসিকতা, মৃদুহাস্য, প্রেমালাপ ও চারু দৃষ্টি বিক্ষেপ কুব্জার মন হরণ করল আর সে ভ্রাতাযুগলকে সেই সুন্দর ও গাঢ় অনুলেপন অঙ্গরাগ প্রদান করল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্যাম অঙ্গে পীত বর্ণের আর শ্রীবলরাম নিজ গৌর অঙ্গে অরুণাভ অঙ্গরাগ ধারণ করলেন। তাঁরা নাভির উপরের অঙ্গে অনুরঞ্জন করে অতিশয় দৃষ্টিনন্দন হলেন। অতঃপর কুব্জাকে কৃপা করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার দিকে তাকালেন।

**পদ্ভ্যামাক্রম্য প্রপদে দ্ব্যঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা।**
**প্রগৃহ্য চিবুকেঽধ্যাত্ম মুদনীনমদচ্যুতঃ ॥**

(১০।৪২।৭)

শ্রীভগবান নিজ চরণযুগল দ্বারা কুব্জার পায়ের পাতাযুগল চেপে ধরলেন আর হাত তুলে দুইটি অঙ্গ দ্বারা তার গ্রীবায় (চিবুক) ধারণ করে তার দেহ উপর দিকে টানলেন।

এইরূপ করাতে ত্রিবক্রার অঙ্গ সোজা ও সুষম হয়ে গেল। প্রেম ও মুক্তি দাতা শ্রীভগবানের স্পর্শে সে সঙ্গে সঙ্গেই অনুপম সুন্দরী এক রমণীরূপে পরিবর্তিত হল। সেই রূপ, গুণ ও উদার চিত্তযুক্ত হয়ে গেল। শ্রীভগবানের অশেষ কৃপা স্মরণ করে সৈরন্ধ্রী তাঁদের গৃহে পদার্পণ করতে অনুরোধ করাতে তাঁরা লীলাকার্য সমাপনে তার গৃহে গমন করতে রাজি হয়ে গেলেন।

অতঃপর শ্রীভগবান চলার পথে পণ্যবীথিকায় গেলেন ও তাম্বূল, পুষ্পমাল্য, চন্দন ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী দ্বারা পূজিত হলেন। পথের রমণীকুল তাঁদের সৌন্দর্য সুধা বিহ্বলচিত্তে পান করতে থাকল।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরার পুরজনদের কাছে ধনুর্যজ্ঞের স্থান জিজ্ঞাসা করে তথায় উপনীত হলেন। সেইখানে তিনি ইন্দ্রধনুসম এক অতি বিশাল অদ্ভুত ধনুক দেখলেন। সেই ধনুকের অঙ্গসজ্জায় বহু সম্পদ ব্যয় করা হয়েছিল ; তা বহু বহুমূল্য অলংকারে সজ্জিত করা হয়েছিল। তার ভালোভাবে পূজা করা হয়েছিল আর কংসের বহু অনুচর তা পাহারা দিচ্ছিল। নিরাপত্তারক্ষীর বাধা দান সত্ত্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ধনুককে সবলে তুলে নিলেন।

**করেণ বামেন সলীলমুদ্‌ধৃতং সজ্যং চ কৃত্বা নিমিষেণ পশ্যতাম্।**
**নৃণাং বিকৃষ্য প্রবভঞ্জ মধ্যতো যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্যুরুক্রম॥**

(১০।৪২।১৭)

সকলের চোখের সামনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ধনুক বাম হস্তে তুলে নিলেন, তাতে জ্যারোপ করলেন আর মুহূর্তের মধ্যে তা আকর্ষণ করে দুটুকরো করে ফেললেন, যেন মদমত্ত হস্তী ইক্ষুদণ্ডকে খেলাচ্ছলে ভেঙে ফেলল।

ধনুর্ভঙ্গে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে ভয়ানক শব্দ হল। সেই শব্দ শ্রবণ করে মহারাজ কংসও ভয় পেল। নিরাপত্তারক্ষী ও কংসের সৈন্যগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে ধরে বন্দী করবার চেষ্টা করল। শ্রীবলরাম তাদের মতিগতি বুঝতে পেরে সাবধান হলেন। কুপিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও

শ্রীবলরাম সেই খণ্ডিত ধনুকের খণ্ড দুইটি তুলে নিলেন আর নিরাপত্তাকর্মী ও কংস প্রেরিত সৈন্যদলও সংহার করলেন।

অতঃপর ভ্রাতাযুগল নির্বিকার চিত্তে যজ্ঞশালার প্রধান দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এলেন আর আনন্দে মথুরা নগর দেখতে লাগলেন। তাঁদের অদ্ভুত পরাক্রমের বার্তা তখন নগরবাসীদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। তাঁদের তেজ, সাহস ও অনুপমরূপ দর্শন করে সকলেই জানল যে তাঁরা নিশ্চয়ই কোনো শ্রেষ্ঠ দেবতা। দিবাবসানে সখাগণের সঙ্গে তাঁরা নগরের উপকণ্ঠে নিজ নিজ বিশ্রামস্থলে ফিরে এলেন।

**গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা আশাসতাশিষ ঋতা মধুপুর্যভূবম্।**
**সম্পশ্যতাং পুরুষভূষণগাত্রলক্ষ্মীং হিত্বেতরান্ নু ভজতশ্চকামহয়নং শ্রীঃ॥**

(১০।৪২।২৪)

দেবী লক্ষ্মীকে ত্রিলোকের দেবতাগণ কামনা করেছিলেন কিন্তু দেবী নিস্পৃহ শ্রীভগবানকেই স্বেচ্ছায় বরণ করে নিজ নিবাসস্থান করলেন। মথুরাবাসী সেই পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেই তাঁর সৌন্দর্য সুধা পান করছেন। কত সৌভাগ্যবান তাঁরা ! ব্রজভূমি থেকে শ্রীভগবানের যাত্রাকালে বিরহাতুর গোপীগণ মথুরাবাসীদের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলেছিলেন তা যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। তারা সত্যই আনন্দ অমৃত আস্বাদন করেছিল।

হস্তপদ প্রক্ষালন করে ভ্রাতাযুগল দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করে নিশ্চিন্তে নিদ্রাগমন করলেন। ধনুর্ভঙ্গ, সৈন্যসংহার বার্তা শ্রবণ করে কংস কিন্তু নিদ্রাগমন করতে বেগ পাচ্ছিল। অর্ধজাগরণে সে বহু অমঙ্গলসূচক ইঙ্গিত পেয়ে মৃত্যু ভয়ে কেঁপে উঠল। জাগ্রত অবস্থাতেই সে দর্পণে ও জলে নিজ দেহ দেখতে পেল কিন্তু তাতে মস্তক ছিল না। বালুকা ও কর্দমে সে নিজ পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছিল না। স্বপ্নাবস্থায় সে দেখল যে সে প্রেতদের সঙ্গে গলাগলি করছে, গর্দভে চড়ে ভ্রমণ করছে আর বিষ পান করছে। দুঃস্বপ্নে সে শয্যায় ছটফট করতে লাগল।

রাত্রি অবসানে রাজা কংস মল্লক্রীড়া মহোৎসব আরম্ভ করালো।

রাজকর্মচারীগণ রঙ্গালয় সাজসজ্জায় যুক্ত হল। তূরী, ভেরি বাদ্য বেজে উঠল। দর্শকমঞ্চ পুষ্পমাল্য, পতাকা, বস্ত্র আদি দ্বারা সুসজ্জিত হল। নাগরিকবৃন্দ যথাস্থান গ্রহণ করল। রাজা কংস নিজ মন্ত্রীদের এবং মণ্ডলেশ্বরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে গিয়ে বসল। অমঙ্গলসূচক চিহ্নসকল দেখে কংস তখনও ভীত ছিল। মল্লবীরগণ বাজনার তালে তালে তাল ঠুকতে ঠুকতে সুসজ্জিত হয়ে মল্লভূমিতে নেমে এল। বাদ্যের সুমধুর ধ্বনি চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল আদি মল্লবীরদের উৎসাহ দিচ্ছিল। তখনই ভোজরাজ কংস নন্দ আদি গোপদের ডাকল। তাঁর উপঢৌকনাদি দিয়ে নির্দিষ্ট মঞ্চে গিয়ে বসলেন।

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামও স্নানাদি নিত্যকর্ম করে দূর থেকে তূরী, ভেরি বাদ্য শ্রবণ করে রঙ্গশালা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে মল্লভূমির প্রবেশ দ্বারে মাহুত সহ কুবলয়াপীড় নামক এক ভয়ানক হস্তী দাঁড় করানো আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইবার কটিবন্ধন শক্ত করলেন ও কুঞ্চিত কেশদাম সংযত করলেন আর মেঘনির্ঘোষে মাহুতকে সাবধান করে বললেন— ওরে মাহুত ! আমাদের পথ ছাড়। দেরি করিস না ; না হলে হাতির সঙ্গে তুইও যমালয়ে যাবি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে যমালয়ে প্রেরণের কথার মধ্যে যেন একটা রহস্য খুঁজে পাওয়া যায়। পরব্রহ্ম পরমেশ্বর যদি স্পর্শ করেন তাহলে তো তার মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়। তিনি তো নিজেই যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করতে সক্ষম তার জন্য অন্য কোনো অধস্তন কর্মচারীর কাছে প্রেরণ করবেন, তা তো হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য তিনি নরলীলা করছেন তাই নররূপে ভয় দেখানোর জন্য যমালয় কথা ব্যবহার করা সম্ভব। অবশ্য যম যদি বিত্তসংযম অর্থে ধরা হয় তাহলে প্রাপ্ত বস্তু মোক্ষ হতে পারে।

ধমক খেয়ে মাহুত কুপিত হল আর সাক্ষাৎ মৃত্যুসম ভয়ংকর কুবলয়াপীড় হস্তীকে অঙ্কুশ বিদ্ধ করে উত্তেজিত করে শ্রীভগবানের দিকে চালিত করল। কুবলয়াপীড় ছুটে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শুঁড়ে জড়িয়ে তুলে নিল। শ্রীভগবান পিছলে এসে হস্তীকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করে তার পায়ের

মাঝে লুকিয়ে পড়লেন। এতে কুবলয়াপীড় আরও ক্ষেপে উঠে শুঁড় দিয়ে তাঁকে ধরতে চাইল। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে শ্রীভগবান সেই বলবান হস্তীর পুচ্ছ ধারণ করে তাকে ক্রীড়াচ্ছলেই শত হস্ত পিছনে টেনে নিয়ে গেলেন আর ডান ও বাঁ দিকে গিয়ে হস্তীকে পরিশ্রান্ত করলেন। অতঃপর তিনি কুবলয়াপীড়ের সম্মুখে এসে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করলেন আর ছুটে পালানোর অভিনয় করলেন। ছুটতে ছুটতে তিনি ভূমিতে পড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ সরে গেলেন। হস্তী সজোরে তাঁকে বিদ্ধ করবার জন্য ভূমিতে দন্ত দিয়ে আঘাত করল। আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে দেখে মাহুতের প্রেরণায় হস্তী তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এইবার ভগবান মধুসূদন হস্তীর কাছে গমন করে এক হাতেই তার শুঁড় ধরে মাটিতে আছাড় মারলেন। হস্তী পড়ে যেতেই শ্রীভগবান সিংহ বিক্রমে ক্রীড়াচ্ছলে তাকে পা দিয়ে চেপে ধরে তার দাঁত দুটো উপড়ে নিলেন আর তখনই হস্তী সহ মাহুত সেই দন্তাঘাতেই যমালয়ে স্থান পেল।

কংসর প্রথম ষড়যন্ত্র এইভাবে ব্যর্থ হল। হস্তীকে ছেড়ে এইবার তাঁর রঙ্গশালায় প্রবেশ হল।

**মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ।**
**অংসন্যস্তবিষাণোঽসৃঙ্ মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ।**
**বিরূঢ়স্বেদকণিকা বদনাম্বুরুহো বভৌ॥**

(১০।৪৩।১৫)

মৃত হস্তী ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হস্তে হস্তীদন্ত ধারণ করেই (যেন আয়ুধ ধারণ করে) মল্লভূমিতে প্রবেশ করলেন। সেই দৃশ্য ছিল অনিন্দ্যসুন্দর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে হস্তীশোণিত বিন্দু ও শ্রীমুখে স্বেদবিন্দুর শোভা ছিল। হস্তীদন্ত তাঁর স্কন্ধে স্থাপিত ছিল।

মহাবলবান শ্রীবলরামও হস্তীর অন্য দন্তটি উৎপাটন করে আয়ুধ রূপে ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ও অন্যান্য সখাদের সঙ্গে রঙ্গশালায় প্রবেশ করলেন। তাঁদের দেখে দর্শকগণের যে যেমন চিন্তা করলেন তার তেমনই অনুভূতি হল। মল্লবীরদের চোখে তাঁরা বজ্রসম ভয়ংকর, সাধারণ

জনগণের চোখে নবরত্ন, রমণীদের চোখে মূর্তিমান কামদেব, গোপদের চোখে পরমাত্মীয়, দুষ্ট নৃপতিদের চোখে শাসনকর্তা, জনক-জননীসম বৃদ্ধদের চোখে শিশু ও পুত্র সম, কংসর চোখে সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞানীদের চোখ বিরাট, যোগীদের চোখে পরম তত্ত্ব আর ভক্ত শিরোমণি বৃষ্ণিবংশের লোকেদের চোখে নিজ ইষ্টদেবতা মনে হল।

কংস স্বয়ং মহাবীর কিন্তু যখন সে দেখল যে সেই দুইজন কুবলয়াপীড়কে বধ করেছে তখন সে বুঝতে পারল যে এদের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন হবে। সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম আজানুলম্বিত বাহু ; পুষ্পমাল্য ও বস্ত্রালংকার আদিতে তাঁদের বিচিত্র বেশবাস। মনে হচ্ছিল যেন উত্তমরূপে সজ্জিত হয়ে দুই নট অভিনয় করতে এসেছেন। তাঁদের মনোহর কান্তি দর্শকদের মন হরণ করল। মথুরার জনগণ ও রাষ্ট্রের জনসমগ্র পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দেখে পরম আনন্দ অনুভূতি লাভ করল। তাদের নয়নকমল যেন প্রস্ফুটিত হল। বালকদের দেখে তাঁদের আনন্দের সঙ্গে উৎকণ্ঠাও হল। তারা সেই দৃশ্য দেখে যেন তৃপ্ত হতে পারছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল যেন নেত্র, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক আদি ইন্দ্রিয় সকল একযোগে সেই অপরূপ রূপ সুধা পান করছে। তাঁদের সৌন্দর্য, গুণ, মাধুর্য ও নির্ভয়তা যেন দর্শকদের তাঁদের লীলার কথাগুলি মনে করিয়ে দিল। যে যেমন শুনেছিল ও দেখেছিল সে তেমনভাবেই সেই সকল কথা বলতে শুরু করল।

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি।
অবতীর্ণাবিহংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি॥

(১০।৪৩।২৩)

এঁরা দুইজন সাক্ষাৎ ভগবান নারায়ণের অংশ। তাঁরা ধরণীতে শ্রীবসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ওই শ্যামসুন্দর তনু দেবকীগর্ভজাত। জন্মের পরই শ্রীবসুদেব এঁকে গোকুলে রেখে এসেছিলেন। সেইখানেই উনি আত্মগোপন করে ছিলেন।

শ্রীনন্দের গৃহে তাঁর এত বড় হওয়া। ইনিঁই পূতনা, তৃণাবর্ত, শঙ্খচূড়, কেশী ও ধেনুক আদি ও দুষ্ট দৈত্যদের বধ করেছেন ও যমলার্জুন উদ্ধার করেছেন। ইনিই ধেনু ও গোপদের দাবানলের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা করেছিলেন। কালিয়নাগ দমন ও ইন্দ্রের মানমর্দনও ইনি করেছিলেন। ইন্দ্রের কোপ থেকে তিনি গোপদের রক্ষা করবার জন্য এক হাতে সাত দিন গিরি গোবর্ধন ধারণ করে রেখেছিলেন। ইনি নাকি যদুবংশকে রক্ষা করবার জন্য এসেছেন। অন্যজন শ্যামসুন্দরের অগ্রজ কমলনয়ন শ্রীবলরাম ; ইনিও অমিত বিক্রম।

ওদিকে মল্লভূমিতে বাদ্য বেজেই যাচ্ছিল। মল্লবীর চাণূর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সম্বোধন করে বসল— শুনলাম তোমরা নাকি মল্লযুদ্ধে সুনিপুণ। মহারাজ তাই তো তোমাদের নিপুণতা দেখবার জন্য এইখানে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন। প্রজাদের তো কায়মনোবাক্যে মহারাজকে আনন্দ দান করাই কর্তব্য, এসো আমরা সেটাই করতে সচেষ্ট হই।

তখন নিজেদের বালক বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চাণূরকে যেন বাজিয়ে দেখলেন। চাণূর তখন উত্তর দিল—তোমরা তো এইমাত্র সহস্র হস্তীর বলধারী কুবলয়াপীড়কে হেলায় বধ করলে। তাই তোমাদের আমাদের মতন বলবানদের সঙ্গেই তো মল্লযুদ্ধ করা উচিত। তাই হে শ্রীকৃষ্ণ ! আমার সঙ্গে তুমি আর মুষ্টিকের সঙ্গে তোমার অগ্রজ বলরাম মল্লযুদ্ধ করবে।

অতএব মল্লযুদ্ধ শুরু হল। শ্রীভগবান চাইলে তাদের এক মুহূর্তেই ধরাশায়ী করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তাঁরা নরলীলা করছেন তাই মল্লভূমিতে নৈপুণ্য প্রদর্শন চলতেই থাকল। মল্লযুদ্ধ জমে উঠল।

নগরের রমণীকুলের এই অসম মল্লযুদ্ধ পছন্দ হচ্ছিল না। তারা বলতে চায় যে রাজার উপস্থিতিতে প্রসিদ্ধ মল্লবীর চাণূর ও মুষ্টিকের সঙ্গে কেন দুইটি কোমল সুকুমার বালককে মল্লযুদ্ধ করতে হবে ? তাদের চোখে এই অসম মল্লযুদ্ধ অনুমোদন করা অন্যায়। তাঁরা যে পরমব্রহ্ম পরমেশ্বর স্বয়ং এ কথা তারা বুঝেও বুঝছিল না। তাই তাদের হা হুতাশ চলতেই থাকল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সেই দুশ্চিন্তার কথা জানতে পেরে ক্রীড়া বন্ধ করে শত্রুবধ করতে তৎপর হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইবার চাণূরের হস্ত আকর্ষণ

করে অতি বেগে তাকে ঘোরাতে লাগলেন আর শেষে তুলে মাটিতে আছাড় মারলেন। চাণূরের প্রাণ তো প্রবল ঘূর্ণিতেই বেরিয়ে গিয়েছিল। শ্রীবলরামের প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে মুষ্টিক রক্ত বমন করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। চাণূর ও মুষ্টিক নিহত হওয়ার পর অন্যান্য মল্লবীরদেরও একই গতি হল। চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোশল মল্লবীরগণ মারা যেতে অন্যান্য মল্লবীরগণ রঙ্গালয় থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। এইবার শ্রীভবগান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সখাদের ডেকে নিলেন। তাঁরা সকলে মল্লভূমিতে পরিবেশিত বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করতে থাকলেন। ভেরি বাদ্যর সঙ্গে কিঙ্কিণীর রুনুঝুনু ও নৃত্য প্রদর্শন মল্লভূমিকে যথার্থ রূপে রঙ্গভূমি করে তুলল। উপস্থিত দর্শকগণ শ্রীভগবানের এই লীলা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হল। ব্রাহ্মণ ও সাধুগণও লীলা প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলেন।

দম্ভের প্রতীক ভোজরাজ কংসও সেইখানে সশরীরে উপস্থিত। তার ভার্যাদ্বয় হল অস্তি ও প্রাপ্তি যার অর্থ 'আমার এই আছে' ও 'আমার এই হবে' এই দুইই তো অহংকারের কারণ হয়। তাই দম্ভরূপ বিগ্রহ কংসর পক্ষে এই দৃশ্য সহ্য করা কষ্টকর হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য আয়োজিত বাদ্যসকল বন্ধ করতে বলল। এইবার দম্ভেমত্ত কংস চিৎকার করে আদেশ দিল— বসুদেবের এই দুশ্চরিত্র পুত্রদ্বয়কে এখনই এইখান থেকে দূর করে দাও। দুর্বুদ্ধি নন্দকে বন্দী কর। বসুদেবও অতিশয় কুটিল ও দুষ্ট তাকে এখনই বধ করো। উগ্রসেন আমার পিতা হয়েও শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুক্ত আছে। তাই তাকে মেরে ফেল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতুল কংসের কথায় কুপিত হয়ে লাফ দিয়ে মঞ্চের উপর উঠে গেলেন। কংস দেখল যে শ্রীকৃষ্ণ তার সম্মুখে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে দাঁড়িয়ে। সে লাফ দিয়ে উঠে হাতে ঢাল তরবারি তুলে নিল। সে মুহুর্মুহু স্থান পরিবর্তন করে শত্রুকে আঘাত হানবার চেষ্টা করল কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রচণ্ড তেজ তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। এইবার গরুড় যেমনভাবে সর্প ধরে তেমনভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসকে ধরে ফেললেন। তাঁর মনে পড়ল যে বিবাহের পরে কনে বিদায়ের সময়ে এই মাতুলই মাতা দেবকীর

কেশ ধরেছিল। এক ধাক্কায় কংসের কিরীট খসে পড়ল আর শ্রীভগবান মাতাকে অপমান করবার প্রতিশোধ নিয়ে কংসের কেশ ধারণ করে তাকে সেই সুউচ্চ মঞ্চ থেকে নীচে ফেলে দিলেন। মাতার অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে পরম স্বতন্ত্র ও সমগ্র প্রাণী ও বিশ্বের আশ্রয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার উপর স্বয়ং লাফিয়ে পড়লেন। তাতেই কংস শেষ হয়ে গেল। সকলের চোখের সামনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংসের মৃতদেহকে সিংহসম টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সকলের মুখ দিয়ে 'হায়, হায়' রব শোনা গেল।

কংস সতত উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই চিন্তা করত। ভোজনে-পানে, শয়নে-গমনে, কথনে ও নিঃশ্বাস গ্রহণে সে সর্বক্ষণ চক্রপাণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই দর্শন করত। এই অবিচ্ছিন্ন স্মরণের ফলে যা বস্তুত দ্বেষভাবেই করা হয়েছিল। তার শ্রীভগবানের সেই রূপ লাভই হয়েছিল। সে সারূপ্য মুক্তি লাভ করেছিল যা বড় বড় তাপস যোগীদের জন্যও কঠিন হয়ে থাকে।

কংসর কঙ্ক ও ন্যাগ্রোধ আদি আটজন অনুজ ছিল। তারা অগ্রজ বধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের দিকে সক্রোধে তেড়ে এল। যখন ভগবান শ্রীবলরাম দেখলেন যে তারা যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী হয়ে ছুটে আসছে তখন তিনি পরিঘ তুলে তাদের অনায়াসে শেষ করে দিলেন। আকাশে দুন্দুভি বাদ্য শোনা গেল। শ্রীভগবানের বিভূতিস্বরূপ শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীশঙ্কর আদি দেবতাগণ পরম আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি ও স্তুতি করতে লাগলেন। অপ্সরাগণ নৃত্য করতে লাগল। বিলাপ কালে কংসরাজার অন্তঃপুরবাসীগণ বলতে লাগল— এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের সমগ্র প্রাণীদের উৎপত্তি ও প্রলয়ের আধার ও ইনিই রক্ষক। যে তাঁর অমঙ্গল কামনা করে ও তাঁর তিরস্কার করে, সে কখনো সুখী হয় না। শ্রীভগবান তখন রমণীদের কাছে গমন করে সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর তিনি যথাবিধি মৃত সকলের সৎকার করালেন।

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম কারাগারে গিয়ে জনক-জননীকে বন্ধন মুক্ত করলেন আর শ্রীচরণে মস্তক রেখে তাদের বন্দনা করলেন।

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্ধনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥
(১০।৪৪।৫১)

পুত্রগণ তাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদন করলেও দেবকী ও বসুদেব তাঁদের জগদীশ্বর জ্ঞানে আলিঙ্গন করলেন না। জগদীশ্বরকে পুত্র রূপে গ্রহণ করতে তাঁদের দ্বিধা হচ্ছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে জনক-জননী তাঁর ঐশ্বর্য ও তাঁর ভগবদ্ভাব টের পেয়ে গিয়েছেন। তিনি জনক-জননীর স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে চান না। তাই যোগমায়া বিস্তার করলেন যা স্বজনদের মুগ্ধ করে তাঁর লীলা সহায়ক হয়ে থাকে। যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ শ্রীবলরাম নিজ জননী জনক সকাশে গমন করে পরম সমাদরে সবিনয়ে বললেন—মাতা আমার ! পিতা আমার ! আমরা তোমাদের সন্তান আর তোমরা আমাদের জন্য সতত উৎকণ্ঠাযুক্ত থাকো তবুও তোমরা আমাদের বাল্য, শৈশব ও কৈশোরের সুখ পাওনি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে তোমাদের কাছে থাকবার সৌভাগ্য লাভ আমাদের হয়নি। তাই সন্তানদের গৃহে বাস করে যে ভালোবাসা ও সুখ লাভ হয় তা আমরা পাইনি। জনক-জননীই এই দেহের জন্ম দেন আর তার প্রতিপালন করে থাকেন ; তখনই এই দেহ ধর্ম, অর্থ, কাম অথবা মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় হয়ে থাকে। যদি কেউ শতবর্ষ পর্যন্ত জীবিত থেকে মাতা ও পিতার সেবা করে তবুও সে সেই উপকার থেকে ঋণমুক্ত হয় না। যে পুত্র সামর্থ্য থাকতেও মাতা-পিতার দেহ ও সম্পদ দ্বারা সেবা করেনা সে যমদূতের হাতে পড়ে মৃত্যুর পর নিজের মাংসই ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি সমর্থ হয়েও বৃদ্ধ মাতা-পিতা, সতী-পত্নী, বালক, সন্তান, গুরু, ব্রাহ্মণের ও শরণাগতর ভরণপোষণ করেনা সে তো জীবিত হয়েও মৃতদেহসম। আমাদের এত দিন বৃথা কেটে গেল কারণ কংসের ভয়ে সতত উদ্বিগ্নচিত্ত থাকায় আমরা তোমাদের সেবা করতে পারিনি। আমার মাতা ও পিতৃদেব ! তোমরা আমাদের ক্ষমা করে দাও। হায় ! দুষ্ট কংস তোমাদের এত কষ্ট দিল কিন্তু আমরা তোমাদের সেবা শুশ্রূষা করতে পারিনি।

ইতি মায়ামনুষ্যস্য হরের্বিশ্বাত্মনো গিরা।
মোহিতাবঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যাপতুর্মুদম্॥
(১০।৪৫।১০)

নরলীলায় বিশ্বাত্মা শ্রীহরির এই কথায় মোহিত হয়ে দেবকী-বসুদেব দের কোলে তুলে নিলেন ও আলিঙ্গন দান করে পরমানন্দ লাভ করলেন। তাঁরা স্নেহ পাশের বন্ধনে পূর্ণরূপে মোহিত হলেন। তাঁরা বাক্‌রোধ হয়ে অশ্রুজলে শ্রীভগবানের জলাভিষেক করলেন।

জননী জনককে সান্ত্বনা দিয়ে দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতামহ শ্রীউগ্রসেনকে মথুরার রাজা করে দিলেন। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংস ভয়ে ভীত যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দশার্হ ও কুকুর আদি বংশজাতদের খুঁজে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তাদের গৃহ ত্যাগ করে কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছিল। শ্রীভগবান তাদের সৎকার করে সান্ত্বনা দিলেন ও প্রচুর ধনসম্পদ দান করে গৃহে ফিরিয়ে আনলেন।

অতঃপর দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম পিতা নন্দগোপের কাছে এলেন আর প্রণাম ও আলিঙ্গন করে বললেন— পিতৃদেব ! তুমি ও মাতা যশোদা পরম স্নেহে আমাদের প্রতিপালন করেছ। বস্তুত তোমরাই আমাদের জনক-জননী। তোমরা এখন ব্রজে ফিরে যাও। আমরা জানি আমাদের বিরহে তোমাদের খুবই কষ্ট হবে। এইখানে আত্মীয়স্বজনদের একটু সুখপ্রদান করে আমরা তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ও অন্যান্য ব্রজবাসীদের বুঝিয়ে পরম সমাদরে বস্ত্রালংকার ও ধাতুনির্মিত তৈজসপত্র দান করে বিদায় দিলেন। তাঁরা আলিঙ্গন করে সজল নয়নে ব্রজ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

———o———

# ভ্রমর গীতি

ব্রজের গোপীদের তাঁদের প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনে যে বিরহজনিত কাতরতা হয়েছিল তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনই বিস্মৃত হননি। যে বিশেষ কার্যের জন্য শ্রীভগবানকে মথুরায় আসতে হয়েছিল তা কংস বধের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল অনেকে তা মনে করলেও, মথুরায় বস্তুত তাঁর থেকে যাওয়ার অন্যান্য প্রয়োজনও ছিল। বৃন্দাবন লীলা পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তখন শেষ করেছেন আর আগামী লীলার উৎস দ্বার মথুরা-লীলার পটভূমিও তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। গোপীগণ সেই পরমাত্মার আস্বাদন করে তাঁর সঙ্গে বাস করতে চান। তাই অনুরাগসম্পন্না গোপীদের বিরহাগ্নিকে প্রশমিত করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তিনি বার্তা প্রেরণের জন্য প্রিয় সখা ও মন্ত্রী শ্রীউদ্ধবকে নির্বাচন করেছিলেন। তিনি ব্রজধাম গিয়েছিলেন বার্তাবহ রূপে মাত্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখাকে বলেছিলেন—হে সৌম্য ! তুমি ব্রজধামে গমন করে জনক শ্রীনন্দ ও যশোদা মাতাকে গিয়ে বল যে আমি ও দাদা শ্রীবলরাম উভয়েই কুশলে আছি। গোপীগণ আমার বিরহে পীড়িত হয়ে আছে। আমার বার্তা দান করে তাদের চিন্তামুক্ত কর। সখার অনুরোধ ও আদেশ পালন করে শ্রীউদ্ধব রথে করে ব্রজধামে উপস্থিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বার্তা পাওয়ার পূর্বেই গোপীগণ শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে মথুরা থেকে কেউ এসেছে। উদ্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গোপীগণের সেই অচেনা পুরুষকে তাঁদের হৃদয়ের বেদনা জানাবার উপায় ছিল না তাই গুঞ্জরণরত এক ভ্রমরকে উদ্দেশ্য করে আবেগকে প্রকাশ করাই হল 'ভ্রমর গীতি'। রাগানুগা ভক্তির এক অনুপম সম্ভার এই 'ভ্রমর গীতি'। পরমাত্মার জন্য আত্মার অবিরাম ক্রন্দন এতে দেখা যায়। মথুরা থেকে গমন করবার সময়ে সখাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন — আমার প্রেয়সী গোপীগণ এই মুহূর্তে অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করে আছে। তাদের আমি

'আবার আসব' কথা দিয়ে এখানে আসতে পেরেছিলাম। সেই আশায় তারা বেঁচে আছে। আমি স্বয়ং তাদের আত্মা। তারা সতত আমার চিন্তাতেই তন্ময় থাকে।

সখার আদেশ শিরোধার্য করে ভক্ত সখা শ্রীউদ্ধব রথে চড়ে নন্দগ্রাম উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁকে দেখে নন্দরাজা আনন্দিত হলেন। আলিঙ্গন দান করে ও তাঁকে শ্রীকৃষ্ণসম মনে করে পাদ্য অর্ঘ্য দান করে উষ্ণ অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরহে ব্রজভূমিতে আনন্দ নেই। তাই নন্দ যশোদা যদিও জানলেন যে সন্তান কৃষ্ণ-বলরাম ভালো আছে তবুও দুধের স্বাদ কী ঘোলে মেটা সম্ভব ? সারা রাত স্মৃতি রোমন্থনে কেটে গেল কিন্তু শ্রীউদ্ধবের ব্রজভূমিতে আসায় লাভ কেবল শ্রীউদ্ধবেরই হল। তিনি দেখলেন যে নন্দলালের প্রতি অপত্যস্নেহ ও মমত্ব বোধ নন্দ-যশোদার মধ্যে এত প্রবল যে নন্দলালের ঈশ্বররূপে আবির্ভাব একটুও দাগ কাটতে পারেনি।

এইখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে ওঠে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে কেন গেলেন না ? উত্তর হয়ত এইরকম—মথুরার শ্রীকৃষ্ণ রাজবেশধারী তা তো বৃন্দাবনের কেউ দেখতে চায় না। তারা চায় গোপ বেশে বনমালা পরিহিত নন্দদুলালকে। বৃন্দাবনের মাধুর্য ও মথুরাতে ঐশ্বর্য এক অঙ্গে কি রাখা সম্ভব ? আর একবার বৃন্দাবনে গেলে কি ব্রজভূমির বিরহ ব্যথা চিরতরে মুছে দেওয়া যাবে ? বৃন্দাবনের বেশবাস যে মথুরাতেও চলবে না। কংস বধ হওয়ার পরে যে কোনও সময়ে কংসের জামাতা জরাসন্ধ মথুরা আক্রমণ করতে পারে ! বৃন্দাবনে গেলে জরাসন্ধ অত্যাচার থেকে ব্রজভূমিকেও বাদ দেবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামের সেই মুহূর্তে ব্রজভূমিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। জরাসন্ধ আবার 'অস্তি-প্রাপ্তির' জনক।

রাত্রি অবসান হয়েছে। ব্রজবাসীগণ নন্দালয়ের সম্মুখে সুবর্ণ মণ্ডিত রথ দেখে আলোচনা করে জানতে চাইল—আবার কে এল ?

**অক্রূর আগতঃ কিং বা যঃ কংসস্যার্থসাধকঃ।**
**যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ॥**

(১০।৪৬।৪৮)

এক গোপী বলল— কংসের দূত অক্রূরই আবার এল না কি ? সেই

(ক্রূরই) তো কমলনয়ন প্রিয় শ্যামসুন্দরকে এইখান থেকে মথুরায় নিয়ে গিয়েছিল। (আবার তার এখানে কী দরকার হল ?)

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আতুর গোপীগণের এমন কথা আলোচনা হচ্ছিল। স্নান-আহ্নিক সেরে আসা শ্রীউদ্ধবের দর্শন তারা তখন পেল।

**তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ প্রলম্ববাহুংনবকঞ্জলোচনম্।**
**পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসম্মুখারবিন্দং মণিমৃষ্টকুণ্ডলম্॥**
(১০।৪৭।১)

গোপীগণ দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণের সেবক শ্রীউদ্ধবের আকৃতি ও বেশবাস শ্রীকৃষ্ণের মতনই। তিনি আজানুলম্বিত বাহু, নবকমলদলসম অরুণাভ নয়ন ও অঙ্গে পীতাম্বরধারী। তাঁর কণ্ঠে কমলপুষ্পমাল্য ও কর্ণে মণিময় কুণ্ডলের দ্যুতি। তিনি অতিশয় প্রফুল্লবদন। পবিত্র হাস্যময়ী গোপীগণ অচেনা পুরুষ শ্রীউদ্ধবকে দেখে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন—'এই সুদর্শন পুরুষ কে ? কোথা থেকে এসেছেন ? ইনি কার দূত ? ইনি শ্রীকৃষ্ণের মতন বেশবাস কেন পরে আছেন ? তাই তাঁর পরিচয় জানতে আগ্রহী গোপীগণ সেই পবিত্রকীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত ও সখা-সেবক শ্রীউদ্ধবকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরলেন। যখন তাঁরা জানতে পারলেন যে আগন্তুক রমাকান্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বার্তা বহন করে এসেছেন তখন তাঁরা যত্নপূর্বক তাঁকে পৃথক আসন দান করে বললেন—হে শ্রীউদ্ধব ! আমরা জানি যে আপনি যদুপতির পার্ষদ। তাঁরই বার্তা নিয়ে আপনি এইখানে উপনীত হয়েছেন। আপনার প্রভু আপনাকে তাঁর জনক-জননীর তুষ্টি বিধান করবার জন্য পাঠিয়েছেন। না হলে এই গোকুলে নন্দগ্রামে তাঁর মনে রাখবার মতন কোনো বস্তু তো পাওয়া কঠিন আর পিতা-মাতার বন্ধন তো বড় বড় মুনি ঋষিগণও ত্যাগ করতে বেগ পেয়ে থাকেন।

এই স্থানে একটা শব্দ লক্ষ করবার মতন। গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'যদুপতি' বলে পরিচয় দিয়েছেন 'গোপীনাথ' বলে নয়। এই 'যদুপতি'র দ্বারা গোপীদের মধ্যে ব্যাঙ্গোক্তির দ্বারা যেন বিরহ বেদনা প্রকাশ হতে দেখা যায়।

গোপীগণ আরও যা বললেন তাতে বক্তব্য যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাঁরা বললেন — প্রীতির সম্বন্ধ তো স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিতই হয়ে থাকে। ভ্রমরের পুষ্পের সঙ্গে, পুরুষের নারীর সঙ্গে এইরকম সম্বন্ধই তো সচরাচর দেখা যায়। বারবণিতাও যখন দেখে খদ্দেরের সম্পদ শেষ হয়ে আসছে তখন সে তাকে ত্যাগ করে। প্রজা ততক্ষণ রাজার আজ্ঞাবহ থাকে যতক্ষণ রাজার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। অধ্যয়ন সমাপনে কোনো শিষ্য আচার্যের খোঁজ রাখে ? যজ্ঞ দক্ষিণা পর্যন্তই যজমানের খাতির থাকে। বৃক্ষ ফলদান বন্ধ করলে পক্ষীগণ তা ত্যাগ করে চলে যায়। নিমন্ত্রিত কখনো নিমন্ত্রণ রক্ষা শেষ হলে গৃহস্বামীর খোঁজ করে ? দাবানল প্রজ্বলিত হলেই পশুরাও অরণ্য ছেড়ে পালায়। রমণীদের চিত্তে অনুরাগ বর্তমান থাকলেও প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে পুরুষদের আর তাদের কী প্রয়োজন ? বস্তুত এইবার তাঁরা আসল কথাটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দূত শ্রীউদ্ধবকে বলেই ফেললেন।

গোপীগণ কায়মনোবাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেই লীন হয়ে ছিলেন। তাঁদের তখন হুঁশ ছিল না যে কাকে কী কথা বললে ঠিক হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকাল থেকে কৈশোর পর্যন্ত যত লীলা সম্পাদিত হয়েছিল গোপীগণ তাই সংকীর্তন করতে লাগলেন। আত্মবিস্মৃত রমণীকুল তখন নারীসুলভ লজ্জাও ভুলে তাঁদের প্রাণবল্লভের চিন্তায় ডুকরে কেঁদে উঠতে লাগলেন।

এক গোপীর তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উষ্ণ সান্নিধ্যর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি দেখলেন যে একটি ভ্রমর কাছে এসেছে।

**কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসমগমম্।**
**প্রিয়প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ॥**

(১০।৪৭।১১)

একজন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গভাবিনী কৃষ্ণময়ী গোপী কৃষ্ণবর্ণ একটি ভ্রমরকে দেখে তাকে প্রিয়তমের দূত জ্ঞানে এইরূপ বলতে লাগলেন :

তিনি সতত শ্রীকৃষ্ণ ভাবে তন্ময় থেকে ভাবনেত্রে প্রিয়তমকে দেখেন ও তার সঙ্গে কথোপকথন, মান-অভিমান করেন। ভ্রমর এসে তাঁর পায়ের কাছে গুঞ্জরণ করছিল। দিব্যোন্মাদ গোপীর মনে হল শ্রীকৃষ্ণই মানভঞ্জনের

জন্য এই শ্মরঞ্জিত ভ্রমরকে পাঠিয়েছেন। পরপুরুষ শ্রীউদ্ধবকে কথাগুলি বলা প্রয়োজন কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তাই সেই রঞ্জিত শ্মশ্রু কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমরকে উদ্দেশ্য করে তাঁর বিরহ বেদনা ফুটে বেরল। যদিও তা ভ্রমরকে উদ্দেশ্য করে বলা তবুও তা দূত মুখে সঠিক ঠিকানায় যাবে, তার ব্যবস্থা হয়ে গেল। গোপী বলতে লাগলেন 'ভ্রমর গীতি'।

**মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃহাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ**
**কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুর্ভিনঃ।**
**বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং**
**যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥**

(১০।৪৭।১২)

ওরে মধুকর ! তোর স্বভাব তোর প্রভুর মতনই ; দুইজনই সমান কপটাচারী। এখন ছলনা করে পা ধরে আমার মানভঞ্জন করতে এসেছিস। তুই ভাবছিস যে তোর শ্মশ্রুতে লেগে থাকা মথুরাবাসী আমার সতীনদের অঙ্গের কুঙ্কুম আমি দেখতে পাইনি ! এইখান থেকে আমি বুঝতে পারছি যে তাদের অঙ্গ পেষণে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠের বনমালার করুণ অবস্থা হয়েছে। সেই বিধ্বস্ত কুঙ্কুমরঞ্জিত বনমালা দেখে যদুবংশের সভায় প্রিয়তমকে সকলে উপহাস করবে আর তুই সেই বনমালার পুষ্পে বসেছিলিস বলে কুঙ্কুম তোর শ্মশ্রুতেও লেগেছে। তুই তোর প্রভুর মতন ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াস। ওরে মধুপ ! তুই বরং মথুরার মধুপতি শ্রীকৃষ্ণর মথুরার মানিনীদের মানভঞ্জন কর। সেই কুঙ্কুম কৃপাপ্রসাদ এইখানে বয়ে নিয়ে আসবার কী দরকার ?

**সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা**
**সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেহস্মান্ ভবাদৃক্।**
**পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্মং তু পদ্মা**
**হ্যপি বত হৃতচেতা উত্তমশ্লোকজল্পৈঃ॥**

(১০।৪৭।১৩)

তুই আর তোর সখা দুইজনই দুর্মতি। মধুকর ! তুই তো পুষ্পে পুষ্পে মধুপান করে বেড়াস আর তোর সখারও আচরণ তো একই রকম। আমরা

একবার সেই মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী ও অতিশয় মাদক অধর সুধা পান করবার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম আর তার পরই আমাদের মতন আপন ভোলা গোপীদের ছেড়ে তিনি কিনা এখান থেকে চলে গেলেন। বুঝিনা, (এমন দুর্মতি পতির) পদসেবা সুকুমারী লক্ষ্মী কেমন করে করেন ! মনে হয় তিনিও সেই উত্তমকীর্তি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য বিন্যাসে প্রলুব্ধ হয়ে পড়েছেন। চিত্তচোর সেইখানেও চিত্ত চুরি করে বসে আছেন।

**কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-**
**মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণম্।**
**বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ**
**ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ॥**

(১০।৪৭।১৪)

ওরে ভ্রমর ! আমরা তো অনিকেত অরণ্যবাসী। আমাদের সামনে যদুবংশ শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করে তোর লাভ কী ? তুই কি আমাদের মানভঞ্জন করতে এসেছিস ? কী লাভ ? তিনি তো আমাদের অপরিচিত নন। তাই তোর এখানে মোসাহেবি করে লাভ নেই। তুই ফিরে তাঁদের কাছে মথুরায় বরং যা, যাঁরা আমাদের কাছ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। সেই মথুরাবাসী শ্রীকৃষ্ণের সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলা তো কম দেখেছেন, তাঁদের তোয়াজ কর, হৃদয় সন্তাপ হরণ কর। তাঁদের কাছ থেকে কোনো মহার্ঘবস্তু পেলেও পেতে পারিস।

**দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ**
**কপটরুচিরহাস ভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।**
**চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা**
**অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমশ্লোকশব্দঃ॥**

(১০।৪৭।১৫)

ওরে ভ্রমর ! তুই কেন বলছিস যে তিনি আমাদের জন্য সতত ছটফট করেন ? আরে এমন রমণীও আছে যে তাঁর কপটতাযুক্ত মনোহর স্মিতহাস্য ও ভ্রূবিলাসে তাঁর বশীভূত হয়ে পড়বে না। ওরে মূর্খ ! ত্রিভুবনে এমন একজনও নেই। অন্য কারো কথা কেন বলি, স্বয়ং দেবী লক্ষ্মীও তো তাঁর

চরণরজ সেবা করে থাকেন। তাঁর সামনে আমরা তো তুচ্ছ ! কিন্তু তুই গিয়ে তাঁকে বলিস যে তাঁর পুণ্যকীর্তি নাম ধারণ করবার সার্থকতা তো দীনহীনদের উপর দয়া করাতেই নিহিত। না করলে যে সে নাম মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে।

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদন্যহং চাটুকারৈ-
রমুনয়বিদুষস্তেহভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্॥
(১০।৪৭।১৬)

ওরে মধুকর ! আমার পায়ে মাথা খুঁড়িস না। আমি জানি যে তুই ক্ষমা-যাচনা করতে সুনিপুণ। মনে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণই তোকে শিখিয়ে পাঠিয়েছেন যে মানভঞ্জন করবার জন্য দূতকে কীভাবে চাটুকারিতা করতে হয়। কিন্তু জেনে রাখ যে এইখানে তোর ওই পথ সফল হবে না কারণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমরা নিজ পতি, পুত্র ও আত্মীয় স্বজনদেরও ত্যাগ করেছি। কিন্তু এতেও তাঁর মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। তিনি এমন নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন যে আমাদের ছেড়ে যেতে তাঁর বাধল না। এমন ব্যক্তির সঙ্গে সন্ধি করা যায় ! সেই অকৃতজ্ঞের কি আবার বিশ্বাস করা আদৌ সম্ভব ?

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কাময়ানাম্।
বলিমপি বলিমমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ ধ্বাঙ্ক্ষবদ্ য
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ ॥
(১০।৪৭।১৭)

ওরে মধুপ ! তোর সখা পূর্বজন্মে শ্রীরামচন্দ্র হয়ে যখন অরণ্যবাসে ছিলেন তখন তিনি কপিরাজ বালীকে ব্যাধসম লুকিয়ে থেকে নির্মম ভাবে হত্যা করেছিলেন। তিনি বেচারি সূর্পণখা কামাতুর হয়ে তাঁর কাছে আসায় স্ত্রীর বশীভূত হয়ে, তিনি তার নাক-কান কেটে দিয়ে কুরূপা করে দিয়েছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের গৃহে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেই বা কী করলেন ? বলি তো তাঁর পূজা করেছিল, তাঁর পছন্দের বস্তুও দিয়েছিল কিন্তু

পূজা ও সেইসকল গ্রহণ করেও তাকে বরুণপাশে বেঁধে তিনি পাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এ তো সেই বলি-ভক্ষণ করা কাক সম আচরণ করা হল, যে ভক্ষণ করবার পরও বলি প্রদাতাকে সপার্ষদ ঘিরে ফেলে জ্বালাতন করে। বেশ থাক! তবে আমরা শ্রীকৃষ্ণ কেন, অন্য কোনও কালো বস্তুর সঙ্গে সখ্যতায় আগ্রহী নই। তুই নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবি—যখন এই ব্যাপার তখন তার সম্বন্ধে কথা বলবার দরকারটা কী? তাহলে ভ্রমর! শোন, একবার যা মনে ধরেছে তাকে ছাড়া যে কঠিন। আমরা চেষ্টা করলেও আলোচনা করা থেকে বিরত হতে পারব না।

**যদনুচরিতলীলাকর্ণপীয়ূষবিপ্রুট্**
**সকৃদদনবিধূতদ্বন্দ্বধর্মা বিনষ্টাঃ।**
**সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা**
**বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্যাং চরন্তি॥**

(১০।৪৭।১৮)

শ্রীকৃষ্ণের লীলারূপ কর্ণামৃতের এক বিন্দুও যে আস্বাদন করে তার রাগ-দ্বেষ, সুখ-দুঃখ আদি সকল দ্বন্দ্ব মিটে যায়। এমনকী বহু লোক নিজ দুঃখময় ও অশান্তি পরিপূর্ণ সিক্ত গৃহাদি ত্যাগ করে অকিঞ্চন হয়ে যায়, নিজের সংগ্রহ পরিগ্রহ রাখে না আর পক্ষীসম ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন যাপন করে। তবুও তারা শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা ছাড়তে পারে না। আমাদের অবস্থা সেইরকমই হয়েছে।

**বয়মৃতমিব জিহ্মব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ**
**কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্য।**
**দদৃশুরসকৃদেতত্তন্নখস্পর্শতীব্র-**
**স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্তা॥**

(১০।৪৭। ১৯)

যেমন কৃষ্ণসার সহজ সরল হরিণীরা ব্যাধের সুমধুর বংশীধ্বনিকে বিশ্বাস করে আর তার জালে বদ্ধ হয়ে প্রাণ দেয়, তেমনই সহজ সরল গোপীরা সেই ছলনাকারী শ্রীকৃষ্ণের কপট কথাগুলি সত্য ভেবে বসে আর তাঁর নখস্পর্শজনিত তীব্র কামব্যাধিতে বার বার কাতর হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের

দূত হে ভ্রমর ! এই সম্বন্ধে তুই আর কিছু বলবি না। বলতে হয় অন্য কথা বলতে পারিস

**প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং**
**বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়য়োঽসি মেঽঙ্গ।**
**নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং**
**সতত ঘুরসি সৌম্য শ্রীবধূঃ সাবাঘাস্তে॥**

(১০।৪৭।২০)

আমাদের প্রিয়তমের প্রিয় সখা। মনে হচ্ছে আমাদের মানভঞ্জনের জন্য আমাদের প্রিয়তম তোমাকে পাঠিয়েছেন। যদি তাই হয় তবে হে প্রিয় ভ্রমর ! তুমি আমাদের সম্মানিত অতিথি। বল, কী চাই ? যা চাও তাই পাবে। আচ্ছা সত্য করে বল তো, তুমি কি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চাও। তুমি জাননা যে তাঁর কাছে একবার গিয়ে পড়লে ফিরে আসা কঠিন হয়। আমরা তো তাঁর কাছে পূর্বে গমন করেছি। তুমি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে কী করবে ? হে প্রিয় ভ্রমর ! তাঁর বক্ষঃস্থল তো সতত প্রিয় ভার্যা লক্ষ্মী অধিকার করে বসে আছেন ! তাহলে আমরা সেইখানে গিয়ে কী করব ?

**অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাঽঽস্তে**
**স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চগোপান্।**
**ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে**
**ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু॥**

(১০।৪৭।২১)

যাই হোক আমাদের প্রিয়তমের প্রিয়দূত মধুকর। আমাদের জানতে ইচ্ছা করে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুরুকুল থেকে ফিরে মথুরায় কুশলে আছেন তো ? তিনি কি কখনো পিতা নন্দবাবা ও মাতা যশোদার, এই বৃন্দাবনের, আত্মীয় স্বজনের ও যাদবদের মধ্যে বাল্যসখাদের স্মরণ করেন ? আর আমাদের মতন তাঁর দাসীদের কথা কখনো বলেন ? হে প্রিয় ভ্রমর ! আমাদের বল যে তাঁর অগুরু সুগন্ধিত শ্রীহস্ত আমাদের মস্তকে আর কখনো আসবে কী না ? আমাদের জীবনে সেই শুভদিন কবে আসবে ?

শ্রীউদ্ধব তখন গোপীদের অনুরাগের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়ে

পড়লেন। সখ্য ও মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগে তাঁরা তখন ডুবে আছেন। 'ভ্রমর গীতি' যেন দিব্যভাবে উন্মাদ গোপীদের তাঁদের প্রিয়সখা প্রতি আকর্ষণের এক অনুপম সৌন্দর্যসম্পন্ন দলিল। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে উন্মুখ গোপীদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বার্তা নিবেদন করবার পূর্বে শ্রীউদ্ধব তাই বললেন :

**অহো যূয়ং স্ম পূর্ণাত্মা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।**
**বাসুদেবে ভগবতি যাসামিত্যর্পিতং মনঃ॥**

(১০।৪৭।২৩)

হে গোপীগণ ! আপনারা কৃতকৃত্য হয়েছেন। সার্থক আপনাদের জীবন। হে দেবীগণ ! আপনারা সমগ্র জগতের পূজ্য কারণ এমন ভাবে অন্তর ও সর্বস্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমর্পণ আর কে করতে পারে ?

শ্রীউদ্ধব আরও বললেন—এ অতিশয় সৌভাগ্যের কথা যে আপনারা পূর্ণ কীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই সর্বোত্তম প্রেমভক্তি লাভ করেছেন আর তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন যা বড় বড় মুনি-ঋষিদের জন্যও সুদুর্লভ হয়ে থাকে। হে মহাভাগ্যবতী গোপীগণ ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আপনারা সেই ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মার প্রতি সেই ভাব প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন যা সকল বস্তুর মধ্যে তাঁকেই দর্শন করায়। সেই ভাব আমি প্রত্যক্ষ করলাম—তা আপনাদের কৃপা বলেই আমি মনে করি।

অতঃপর শ্রীউদ্ধব গোপীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বার্তা হুবহু তাঁরই ভাষায় বলেছেন :

**ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ।**
**যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুরগ্নির্জলং মহী।**
**তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণভূতেন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥**

(১০।৪৭।২৯)

আমি উপাদানরূপে সকলের আত্মা সর্বঅনুভূত, তাই আমার সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ কখনই সম্ভব নয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চভূতেরই সব সৃষ্টি আর তাই সকল বস্তুতে ব্যাপ্ত ও তাই তার রূপ। তেমন ভাবেই আমি মন, প্রাণ, পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহে অনুস্যূত হয়ে আছি।

বস্তুত আমার ও তার মধ্যে প্রভেদ নেই ; আমিই তাদের রূপে অবভাসিত হই।

আমিই মায়া অবলম্বন করে পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহের রূপে তাদের আশ্রয় হয়ে যাই আর স্বয়ং নিমিত্তত্ত্ব হয়ে নিজেকেই সৃষ্টি, পালন ও সংহার করি।

যেমনভাবে নদীসকল বহু পথ অতিক্রম করে সমুদ্রে মিলিত হয়ে থাকে সেইভাবে মনস্বী ব্যক্তিগণ বেদাভ্যাস, যোগ সাধনা, আত্মানাত্ম বিবেক, ত্যাগ, তপস্যা, ইন্দ্রিয় সংযম ও সত্য আদি সকল ধর্মে আমার প্রাপ্তিতেই সম্পূর্ণ হয়ে থাকেন। সকল বস্তুর প্রকৃত ফল আমার সাক্ষাৎকার লাভ করা কারণ তা মনকে নিগ্রহ করে আমার কাছে নিয়ে যায়। তাই আমার সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ কেমন করে হবে ?

**যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্।**
**মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া॥**

(১০।৪৭।৩৪)

হে গোপীগণ ! আমি যে তোমাদের নয়নমণি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তোমাদের কাছ থেকে দূরে আছি তার কারণ আছে। আমি চাই যে তোমরা আমার অনুধ্যানে নিত্যযুক্ত থাকো ; জাগতিক দূরত্ব থাকলেও মনে আমার সান্নিধ্য অনুভব কর ; তোমাদের মন আমার কাছে দিয়ে রাখো।

**ময্যাবেশ্য মনঃ কৃৎস্নং বিমুক্তাশেষবৃত্তি যৎ।**
**অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্যম চিরান্মামুপৈষ্যথ॥**

(১০।৪৭।৩৬)

অশেষ বৃত্তি বিরহিত সম্পূর্ণ মন আমাতে নিত্যযুক্ত রেখে যখন তোমরা আমার অনুস্মরণ করবে তখনই অতি শীঘ্রই আমাকে লাভ করবে।

বৃন্দাবনে শারদপূর্ণিমা রাত্রে যে গোপীগণ আত্মীয়স্বজনের বাধাদানের ফলে রাসক্রীড়াতে যোগ দিতে পারেনি, তারা গৃহে থেকেই আমার লীলা সকল স্মরণ করে আমাকেই লাভ করেছিল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমৃতময় বার্তা শ্রবণ করে গোপীগণ তখন সোজাসুজি শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে কথোপকথনে যুক্ত হয়েছিলেন। গোপীরা বললেন—কংস বধ হয়েছে, যদুবংশজাতদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, তারা

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেছে, খুব আনন্দের কথা। শ্রীকৃষ্ণ সুখে থাকলেই আমরা সুখী। তবে তাঁর কি এখনও বৃন্দাবনের সেই রাসমণ্ডলের মধ্যে বিহার করবার কথা মনে আছে ?

গোপীরা শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অতিশয় ব্যাকুল হয়ে শ্রীউদ্ধবের সামনেই মথুরার দিকে মুখ করে দুই বাহু তুলে অতি করুণভাবে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর শরণাগতির জন্য বিলাপ করতে লাগলেন। শ্রীউদ্ধব অবাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

**হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন।**
**মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুলং বৃজিনার্ণবাৎ॥**

(১০।৪৭।৫২)

হে প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ ! তুমি আমাদের জীবনের অবলম্বন, আমাদের সর্বস্ব। হে প্রিয় ! তুমি রমানাথ হলেও আমাদের জন্য ব্রজনাথই। তুমি ব্রজগোপীদের একমাত্র প্রকৃত প্রভু। হে শ্যামসুন্দর ! তুমি বারে বারে আমাদের সঙ্কট হরণ করেছ, ক্লেশ নিবারণ করেছ। হে গোবিন্দ ! তোমার এই সমগ্র গোকুল—যাতে সহচর বালক, জনক-জননী, ধেনু ও গোপীরা সকলেই আছে—দুঃখের অপার সাগরে ডুবে যাচ্ছে। তুমি এসে উদ্ধার কর।

শ্রীউদ্ধব তাঁদের **'ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ'**—আমার সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ নেই বারে বারে বলে শান্ত করলেন।

শ্রীউদ্ধব জানেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম পরমেশ্বর স্বয়ং। মথুরায় পরব্রহ্ম দর্শন করে ব্রজভূমিতে এসে সেই পরব্রহ্মর হ্লাদিনী শক্তির তাঁর দর্শন লাভ হল। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ তাই গোপীগণকে শ্রীউদ্ধবের প্রণাম করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু তিনি জানেন গোপীগণ তাঁকে প্রণাম করতে দেবেন না। তাই মহাভাবে আরূঢ় গোপীদের স্তুতি করে তিনি বললেন—

**এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো**
**গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।**
**বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ং চ**
**কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥**

(১০।৪৭।৫৮)

এই ধরণীতে কেবল এই গোপী দেহ ধারণ করাই সার্থক কারণ তাঁরা সর্বাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমময় দিব্য মহাভাবে অবস্থান করেন। প্রেমের এই সর্বোচ্চ ভূমি ভবভয়যুক্ত মুমুক্ষুদের জন্যই কেবল নয়, বড় বড় মুনিঋষি, মুক্ত পুরুষ ও আমাদের মতন ভক্তদের জন্যও বাঞ্ছনীয়। আমরা তা লাভ করতে পারিনি। এই কথা সত্য যে যাঁর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত আস্বাদন হয়েছে তাঁর কুলীনতা, দ্বিজাতিগত সংস্কার ও বড় বড় যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন আদৌ নেই। অথবা যদি শ্রীভগবানের লীলামৃত আস্বাদন না হয় তাহলে কল্পে কল্পে বারে বারে শ্রীব্রহ্মা হয়েও তার লাভ নেই।

শ্রীউদ্ধব কামনা করেছিলেন তিনি যেন পরের জন্মে বৃন্দাবনের গুল্মলতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন কারণ তাতেই তো সেই মহাভাবে আরূঢ় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি গোপীদের পদরজ স্পর্শ লাভ করে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। এই কামনা সর্বকালের ভক্তদের মধ্যে এখনও বর্তমান। আজও শ্রীবৃন্দাবনের পদরজর কাছাকাছি থাকবার জন্য ওই আকৃতি ধারণ করে আছে।

———o———

# প্রতিশ্রুতিপালন

কংস বধের পর সর্বাত্মা ও সর্বদর্শী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর দেওয়া কথা রাখবার জন্য কুব্জা সৈরন্ধ্রী ও শ্রীঅক্রূর সকাশে গমন করেছিলেন। প্রথমে তিনি মহাভক্ত সখা ও মন্ত্রী শ্রীউদ্ধবকে নিয়ে সৈরন্ধ্রীর গৃহে গমন করলেন।

কুব্জার গৃহ মূল্যবান সামগ্রীতে সুসজ্জিত ছিল। তাতে শৃঙ্গার রস উদ্দীপক বহু বস্তুর সমাহার ছিল। মুক্তামণিমালার ঝালর ছিল ও বহু স্থানে পতাকার শোভা ছিল। চন্দ্রাতপ ও উপবেশন করবার জন্য অতিশয় সুন্দর আসন পাতা ছিল। ধূপের সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। দীপশিখা স্থানকে আলোকিত করে রেখেছিল।

শ্রীভগবানকে তার গৃহে আসতে দেখে কুব্জা তৎক্ষণাৎ তড়িৎ গতিতে নিজ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালো আর সখীদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিধিমতো অভ্যর্থনা করল। অতঃপর সে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করে বিবিধ উপচারে শ্রীভগবানের পূজার্চনা করল।

কুব্জা শ্রীভগবানের পরম ভক্ত শ্রীউদ্ধবেরও পূজার্চনা করল। কিন্তু কুব্জাদত্ত আসন স্পর্শ করে তিনি ভূমিতে বসলেন। নিজ প্রভুর সম্মুখে আসনে বসতে তিনি রাজি হলেন না। সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান লোকাচার পালন করে তৎক্ষণাৎ সেই কুব্জার সুসজ্জিত শয্যায় উপর উঠে বসলেন। তখন কুব্জা স্নান, অঙ্গরাগ, বস্ত্রালংকার, কণ্ঠহার, সুগন্ধি, তাম্বূল আদি দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে লীলাময় লজ্জাযুক্ত হাস্য ও ছলাকলার সহিত শ্রীভগবানের দিকে দেখতে দেখতে তাঁর কাছে এল। শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সংকোচ তাকে ঘিরে ছিল। তাই শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন আর তার কঙ্কণ সুশোভিত বাহু ধারণ করে তাকে কাছে উপবেশন করিয়ে তার ইচ্ছা পূরণ করলেন। কুব্জা এই জন্মে কেবল একবার শ্রীভগবানকে অঙ্গরাগ অর্পণ করেছিল আর সেই শুভকর্মের প্রসাদ রূপে সে এমন পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেল।

সানঙ্গতপ্তকুচয়োরুরসস্তথাক্ষ্ণো র্জিঘ্রন্ত্যনন্তচরণের রুজো মৃজন্তী।
দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপম্॥
(১০।৪৮।৭)

কুব্জা কাম সন্তপ্ত হৃদয়, বক্ষঃস্থল ও নেত্রযুগলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদস্পর্শ লাভ করে ও তার আঘ্রাণ নিয়ে নিজ অন্তরের তৃষ্ণা শান্ত করে দিল। আনন্দঘন প্রিয় শ্যামসুন্দরের আলিঙ্গনে তার দীর্ঘকালের বিরহ সন্তাপ শান্ত হল।

সৈবং কৈবল্যনাথং তং প্রাপ্য দুষ্প্রাপমীশ্বরম্।
অঙ্গরাগর্পণেনাহো দুর্ভগেদময়াচত॥
(১০।৪৮।৮)

কুব্জা কেবল অঙ্গরাগ সমর্পণ করেছিল। তাতেই তার সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের প্রাপ্তি হল। শ্রীভগবান কৈবল্যমোক্ষের অধীশ্বর যার প্রাপ্তি অতিশয় কঠিন। তা লাভ করেও সেই দুর্ভাগিনী ব্রজভূমির গোপীদের মতন সেবা যাচনা না করে তাঁর সঙ্গে বাস করে সঙ্গ প্রার্থনা করল।

শ্রীভগবান সর্বজনহিতকর ও সর্বেশ্বর। অভীষ্ট বরদান ও কুব্জার পূজা স্বীকার করে তিনি প্রিয় ভক্ত শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে গৃহে ফিরে এলেন। শ্রীভগবান শ্রীব্রহ্মাদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর তাই তাঁকে প্রসন্ন করতে পারা জীবের জন্য কঠিনই হয়ে থাকে। তাঁকে প্রসন্ন করে যে বিষয়সুখ কামনা করে তাকে দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন বলাই বোধহয় ঠিক।

অতঃপর অন্য এক দিন সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও শ্রীউদ্ধবকে নিয়ে শ্রীঅক্রূরকে দেওয়া কথা রাখতে গেলেন। শ্রীঅক্রূর দূর থেকেই দেখলেন যে তাঁর পরম প্রিয় নরলোকশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়েই আসছেন। শ্রীঅক্রূর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে প্রণাম করলেন আর শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে ভ্রাতাযুগলও তাঁকে প্রণাম করলেন। যখন সকলে আসনে উপবেশন করলেন তখন শ্রীঅক্রূর তাঁদের বিধি অনুসারে পূজা করলেন।

প্রথমে তিনি শ্রীভগবানের চরণযুগল প্রক্ষালন করে পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি দিব্যবস্ত্র, গন্ধ, পুষ্পমাল্য ও শ্রেষ্ঠ

অলংকারে শ্রীভগবানের পূজার্চনা করলেন আর মস্তক অবনত করে তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর শ্রীভগবানের শ্রীচরণ কোলে নিয়ে সেবা করতে লাগলেন।

এইবার শ্রীঅক্রূর বিনয়াবণত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে বললেন—এ অতি আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা যে পাপী কংস সদলে মারা পড়েছে। আপনাদের কৃপায় যদুবংশ এক বিশাল সংকট থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ হল। আপনারা জগতের কারণ ও জগদ্‌গুরু আদিপুরুষ। আপনাদের ব্যতিরেকে অন্য কোনো বস্তুই নেই, কার্যও নেই আর কারণও নেই।

**সৃজস্যথো লুম্পসি পাসি বিশ্বং রজস্তমঃসত্ত্বগুণৈঃ স্বশক্তিভিঃ।**
**ন বধ্যসে তদ্‌গুণকর্মভির্বা জ্ঞানাত্মনস্তে ক্ব চ বন্ধহেতুঃ॥**
(১০।৪৮।২১)

আপনারা রজোগুণ, সত্ত্বগুণ ও তমোগুণরূপ নিজ শক্তি দ্বারা যথাক্রমে জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন ; কিন্তু আপনারা সেই গুণসমূহে অথবা তার দ্বারা কৃত কর্মবন্ধনে যুক্ত হন না কারণ আপনারা শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। এমন অবস্থায় আমাদের বন্ধনের কারণ বলে কিছু নেই।

**স ত্বং প্রভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ।**
**অক্ষৌহিণীশত বধেন সুরেতরাংশরাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্॥**
(১০।৪৮।২৪)

হে প্রভু ! আপনি এই নিজ অংশ শ্রীবলরামকে সঙ্গে নিয়ে ভূভার হরণার্থ শ্রীবসুদেবের গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনারা অসুর অংশে উৎপন্ন নামমাত্র নৃপতিদের শত-শত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংহার করবেন আর যদুবংশের যশোবৃদ্ধি করবেন।

হে ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মা ! দেবতা, পিতৃপুরুষ, ভূতগণ ও নৃপতিগণ সকলই বস্তুত আপনারই বিভিন্ন রূপ। আপনার শ্রীপাদপদ্ম নিঃসৃত গঙ্গা ত্রিভুবনকে পবিত্র করে। আপনি সমগ্র জগতের একমাত্র পিতা ও শিক্ষক। আমার গৃহে আজ আপনার শুভাগমন হয়েছে। আমার গৃহ যে আজ ধন্য হল তাতে সন্দেহ নেই। তার আজ সীমাহীন সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

ভক্তবৎসল ও ভববন্ধনমোচন হে প্রভু ! যোগী শ্রেষ্ঠ ও দেবরাজও আপনার স্বরূপ জানতে পারেন না। কিন্তু আমার কত সৌভাগ্য যে আমি আপনার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করলাম। হে প্রভু ! আমরা স্ত্রী, পুত্র, স্বজন, সম্পদ, দেহ গেহর মোহ পাশে আবদ্ধ হয়ে আছি। যদিও তা আপনার মায়াধীন তবুও আমাদের এই বন্ধন থেকে সত্বর মুক্তি দান করুন।

ভক্ত শ্রীঅক্রূরের পূজা ও স্তুতি শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন — হে তাত ! আপনি তো আমাদের গুরুজন, হিতাকাঙ্ক্ষী ও পিতৃব্য। আপনার সম্মুখে আমরা তো বালক মাত্র। আপনিই তো আমাদের রক্ষা, প্রতিপালন ও কৃপার আধার।

আপনার মতন পরমপূজ্য ও মহাভাগ্যবান সন্তদের সতত সেবা করা উচিত। আপনারা তো দেবতাদের থেকেও বড় কারণ দেবতারা তো স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে প্রবৃত্ত হন, যা সন্তগণ করেন না।

**ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।**<br>
**তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥**

(১০।৪৮।৩১)

কেবল জলময় তীর্থই (নদী, সরোবর আদিই) তীর্থ নয়, কেবল মৃত্তিকা ও শিলা নির্মিত বিগ্রহই দেবতা নয়। হে পিতৃব্য ! তাদের তো শ্রদ্ধাপূর্বক বহুদিন ধরে সেবা করলে তখন পবিত্র হওয়া সম্ভব হয় কিন্তু সন্তব্যক্তির দর্শন লাভেই সেই পবিত্রতা লাভ হয়ে থাকে।

এই তত্ত্বকথা শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত তাই তার গুরুত্ব অপরিসীম। তা যেন যুগে যুগে ভক্তকে সঠিক দিগ্‌দর্শন করে যাচ্ছে।

শ্রীঅক্রূরকে হস্তিনাপুর গমন করবার সদুপদেশ দিয়ে সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম ও শ্রীউদ্ধবের সঙ্গে ঘরে ফিরে গেলেন।

———○———

# রুক্মিণী হরণ লীলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন। এই দ্বারকা গমনও সেই সময় হয়েছিল যখন কালযবন তিন কোটি সৈন্য নিয়ে মথুরা আক্রমণ করেছিল আর নিহত কংসরাজার জামাতা জরাসন্ধও অষ্টাদশবার আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তখনই আত্মীয়স্বজনদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সকলকে নিয়ে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় গমন হয়েছিল। কালযবন মুচকুন্দ দ্বারা ভস্মীভূত হওয়ার পরও আমরা জরাসন্ধের বধ আরও পরে হতে দেখি। তাঁর মধ্যেই এই 'রুক্মিণী হরণ' ঘটনা ঘটেছিল।

বিদর্ভদেশের অধিপতি মহারাজ ভীষ্মক। তাঁর পাঁচ পুত্র যথাক্রমে রুক্মী, রুক্মরথ, রুক্মবাহু, রুক্মকেশ ও রুক্মমালী আর এক কন্যা সতী রুক্মিণী। অতিথিদের মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, পরাক্রম, গুণ ও বৈভবের প্রশংসা শ্রবণ করে রাজকন্যা রুক্মিণী মনে মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই পতিরূপে নির্বাচন করে রেখেছিলেন। দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ভাবতেন—'রুক্মিণী সুলক্ষণা ও পরম বুদ্ধিমতী ; উদারতা, সৌন্দর্য, শীলস্বভাব ও গুণেও অদ্বিতীয়। তাই রুক্মিণীই ভার্যারূপে আমার উপযুক্ত। তাই তিনিও রুক্মিণীদেবীকে বিবাহ করতে উৎসুক ছিলেন। অবশ্য কন্যার আত্মীয়স্বজন তা চাইলেও অগ্রজ রুক্মী শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী ছিল। সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও ভগিনী রুক্মিণীর বিবাহ অনুমোদন করলো না আর তা শিশুপালের সঙ্গেই হওয়া সমীচীন মনে করল।

অগ্রজের মনোবাসনা ভগিনীকে কষ্ট দিল। পরমা সুন্দরী রাজকন্যা রুক্মিণী অগ্রজের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক ভাবনা চিন্তা করে এক বিশ্বাসী ব্রাহ্মণকে তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে পাঠালেন। যখন সেই ব্রাহ্মণদেবতা দ্বারকাপুরী পৌঁছালেন তখন দ্বারপাল তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেল। সেইখানে উপনীত হয়ে ব্রাহ্মণদেবতা দেখলেন যে আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে বিরাজমান রয়েছেন। ব্রাহ্মণদের

পরমভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণকে তাঁর কাছে আসতে দেখলেন। তিনি সিংহাসন থেকে নেমে ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। আসন দান করে তিনি ব্রাহ্মণদেবতাকে তেমন ভাবেই পূজার্চনা করলেন যেমন ভাবে দেবতারা তাঁর পূজা করে থাকেন। পূজা, অন্নদান, বিশ্রাম ও সেবার পর তিনি ব্রাহ্মণের পদসেবাও করলেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণ দেবতাকে প্রশ্ন করলেন— হে ব্রাহ্মণ শিরোমণি ! আপনি চিত্তে সন্তুষ্টি লাভ করেছেন তো ? শাস্ত্রবিধি অনুসারে ধর্মপালন করতে গিয়ে কোনো অসুবিধা হয় নি তো ? অতঃপর শ্রীভগবান ব্রাহ্মণকে বললেন— সন্তুষ্টি হল জীবনের পরম মন্ত্র। যে প্রাপ্ত বস্তুতেই সন্তুষ্ট থাকে সেই প্রাণীকুলের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। সেই স্বভাবে অহংকার বিরহিত ও শান্ত প্রকৃতির হয়। ব্রাহ্মণ এই সকল গুণের আকর হয়ে থাকেন বলে আমি তাঁদের সতত প্রণাম করি। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পরিচয়াদি জেনে আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। ব্রাহ্মণদেবতা জানালেন যে তিনি শ্রীভগবানের জন্য রাজকন্যা রুক্মিণীদেবীর বার্তা শ্রীভগবানকে নিবেদন করলেন—

**শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে**
**নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।**
**রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং**
**ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥** (১০।৫২।৩৭)

হে ত্রিভুবনখ্যাত শ্যামসুন্দর ! হে অচ্যুত ! আপনার যে গুণসকল শ্রবণ পথে অন্তরে প্রবেশ করে শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্ম-জন্মান্তরের জ্বালা দূর করে এবং আপনার যে রূপ নেত্রযুক্ত জীবের নেত্রের চতুর্বর্গফল ও স্বার্থ-পরমার্থ প্রদান করে, সেই সকল গুণ ও রূপের কথা শ্রবণ করে আমার চিত্ত লজ্জা বাধা অতিক্রম করে আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছে।

**কা ত্বা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপ**
**বিদ্যাবয়োদ্রবিণধাম ভরাত্মতুল্যম্।**
**ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা**
**কালে নৃসিংহ নরলোকমনোঽভিরামম্॥** (১০।৫২।৩৮)

হে প্রেমময় শ্যামসুন্দর ! কুল, শীল, স্বভাব, সৌন্দর্য, বিদ্যা, অবস্থা,

ধনসম্পদ ও ধাম সব দিক দিয়েই আপনি অদ্বিতীয়। প্রাণীকুল আপনাকে দেখে শান্তির অনুভূতি লাভ করে আনন্দিত হয়। হে মুকুন্দ ! হে নৃসিংহদেব ! বিবাযোগ্যা কুল-গুণ-ধৈর্যবতী কন্যাদের জন্য তো আপনি হলেন আদর্শ পতি।

**তন্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-**
**মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো বিধেহি।**
**মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্**
**গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ** ॥ (১০।৫২।৩৯)

তাই হে প্রিয়তম ! আমিও আপনাকে পতিরূপে বরণ করেছি। আপনার কাছে আত্মনিবেদন করেছি। আপনি অন্তর্যামী তাই আমার অন্তরের কথা আপনার অজানা নয়। আপনি কৃপা করে এইখানে এসে আমাকে ভার্যারূপে স্বীকার করে নিন। হে কমলনয়ন ! হে প্রাণবল্লভ ! আমি আপনার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়েই আছি, আমি আপনারই। এখন সিংহের গ্রাস শৃগাল যেন স্পর্শ না করে, শিশুপাল যেন আমাকে স্পর্শ না করে।

**পূর্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্র**
**গুর্বর্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ।**
**আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং**
**গৃহ্ণাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে॥** (১০।৫২।৪০)

যদি আমি পূর্বজন্মে পূর্ত (কূপ, জলাশয় খনন), ইষ্ট (যজ্ঞাদি করা) দান, নিয়ম, ব্রত ও দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরু আদি পূজা দ্বারা পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের আরাধনা করে থাকি ও তিনি যদি আমার উপর প্রসন্ন থাকেন, তাহলে যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসে আমার পাণিগ্রহণ করেন ; শিশুপাল অথবা অন্য কোনো পুরুষ যেন আমাকে স্পর্শ না করে।

**শ্বোভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্**
**গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।**
**নির্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য**
**মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্যশুল্কাম্॥** (১০।৫২।৪১)

হে প্রভু ! আপনি তো অজিত। যে দিন আমার বিবাহ স্থির হয়েছে তার

পূর্ব দিবসে আপনি আমাদের রাজধানীতে গোপনে আসুন এবং তারপর বড় বড় সেনাপতিদের সঙ্গে শিশুপাল ও জরাসন্ধকে সৈন্যসহিত পরাভূত করে তছনছ করে দিন আর বলপ্রয়োগ করে রাক্ষসবিধিতে বীরত্বের মূল্য দিয়ে আমার পাণিগ্রহণ করুন।

**অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূং**
**ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্।**
**পূর্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেবযাত্রা**
**যস্যাং বহির্নববধূর্গিরিজামুপেয়াৎ॥** (১০।৫২।৪২)

'তুমি অন্তঃপুরে রমণীগণ পরিবৃত থাকবে ; তোমার আত্মীয়স্বজনকে বধ না করে আমি তোমাকে কেমন করে বিবাহ করব ?' — এই আশঙ্কা থাকলে আমি এক উপায় বলছি। বিবাহের আগের দিন আমাদের কুলপ্রথানুসারে এক মহাসমারোহের আয়োজন হয়ে থাকে। কুলদেবীকে প্রণাম নিবেদন নিমিত্ত নববধূকে নগরের উপকণ্ঠে অবস্থিত গিরিজাদেবীর মন্দিরে গমন করতে হয়।

**যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো**
**বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।**
**যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং**
**জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্শতজন্মভিঃ স্যাৎ॥** (১০।৫২।৪৩)

হে কমললোচন ! উমাপতি ভগবান শংকরের মতন প্রণম্য দেবতারাও আত্মশুদ্ধি হেতু আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শপ্রাপ্ত ধূলিতে স্নান করতে উৎসুক থাকেন। যদি আমি সেই প্রসাদে অর্থাৎ শ্রীচরণরজ লাভ করতে সক্ষম না হই তাহলে আমি আমার দেহকে ব্রত দ্বারা বিশুষ্ক করে প্রাণত্যাগ করব। আপনার জন্য যদি শতবারও জন্মগ্রহণ করতে হয় তাও শ্রেয় ; কারণ একদিন তো সেই প্রসাদ লাভ করতে আমি সক্ষম হবই।

বার্তা সমাপন হল। ব্রাহ্মণদেবতা বললেন— হে যদুবংশ শিরোমণি ! শ্রীরুক্মিণী গোপন বার্তা বহন করেই আমি আপনার কাছে এসেছি। করণীয় স্থির করে তা অনতিবিলম্বে করুন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন— হে ব্রাহ্মণদেবতা ! বিদর্ভ রাজকুমারী যেমন

আমাকে লাভ করতে ইচ্ছুক আমিও অনুরূপ ইচ্ছা করি। তাঁর উদ্দেশ্যে তদ্‌গতচিত্ত থাকায় আমার রাত্রিকালীন নিদ্রাসুখও বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি জানি রুক্মী বাধা দিচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গেই চলুন।

রুক্মিণীদেবী প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং। তাঁর নারায়ণকে আত্মনিবেদন বার্তা ভক্তগণ আজও পরম শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করেন। বার্তা সপ্তপদ বা সপ্ত শ্লোক বিশিষ্ট। কথিত আছে যে রুক্মিণীদেবী বার্তা সৃষ্টি কালে প্রতি শ্লোকের পর একবার করে নারায়ণকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন। সেই প্রথা অবলম্বন করে আজও শুভবিবাহে সপ্তপদী অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সপ্তপদী সপ্তপদকে মনে করায় আর সাতবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করে অঙ্গীকার করায়।

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে আগামীকালের পরদিন (পরশু) রাত্রেই রুক্মিণীর বিবাহ লগ্ন স্থির করা হয়েছে। তিনি সারথি দারুককে রথ প্রস্তুত করতে বললেন। দারুক অনতিবিলম্বে শৈব্য, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প ও বলাহক নামক চারটি ঘোড়া যুক্ত করে শ্রীভগবানের রথ নিয়ে এল আর হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ব্রাহ্মণদেবতাকে রথে তুলে তারপর নিজে রথে উঠলেন। বিদ্যুৎবেগে সেই রথ এক রাত্রেই আর্তদেশ থেকে বিদর্ভদেশে পৌঁছে গেল। তিনি গিয়ে দেখলেন যে রুক্মীর মন জুগিয়ে কুন্তিনরেশ মহারাজ ভীষ্মক নিজ কন্যা রুক্মিণীকে শিশুপালের হাতে দান করবার জন্য নগরকে বিবাহসাজে সুসজ্জিত করেছেন।

রাজকন্যা রুক্মিণীর বিবাহ উপলক্ষে নগরের জনগণ বস্ত্রালংকার, পুষ্পমাল্য, সুগন্ধিত আতর চন্দন প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত ছিল। গৃহসমূহে ধূপের সুগন্ধ ছিল। রাজা ভীষ্মক পিতৃপুরুষ ও দেবতাদের বিধি মতো পূজা করিয়ে ব্রাহ্মণদের আহার করালেন ও স্বস্তিবাচন করালেন। সুসজ্জিতা সুদর্শনা পরমাসুন্দরী রুক্মিণীদেবীকে স্নান করানো হল আর তাঁর হস্তে মাঙ্গলিক সূত্র, কঙ্কণ পরানো হল আর উত্তম বস্ত্রালংকারও ধারণ করানো হল। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সাম, ঋক ও যজুর্বেদের মন্ত্রে তাঁকে রক্ষা করে, অথর্ববেদের বিদ্বান পুরোহিত গ্রহ শান্তির জন্য যজ্ঞাদি করলেন। ব্রাহ্মণদের সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র, তিলগুড় ও ধেনু দান করা হল।

ওদিকে চেদিরাজ দমঘোষও নিজ পুত্র শিশুপালের জন্য মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুত্র বিবাহের জন্য মাঙ্গলিক কার্যাদি করালেন। অতঃপর তিনি মদমত্ত হস্তী, সুবর্ণমাল্য সজ্জিত রথ, পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার নিয়ে (চতুরঙ্গ সৈন্যসহ) কুণ্ডিনপুর গিয়ে পৌঁছালেন। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে এলেন ; যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা ও প্রথানুসারে পূজার্চনা সবই হল। অতঃপর তাঁদের পূর্ব-নির্ধারিত অতিথিশালায় সানন্দে স্থান দেওয়া হল। সেই বরযাত্রীদের মধ্যে শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র, বিদূরথ ও পৌণ্ড্রক আদি শিশুপালের সহস্র মিত্র রাজাগণ ছিল। তারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শত্রুপক্ষ ছিল আর শিশুপালের বিবাহ যাতে রুক্মিণীর সঙ্গেই হয় তার পক্ষে ছিল। তারা সকলেই সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল।

শত্রুপক্ষের রাজাদের প্রস্তুতির কথা ভগবান শ্রীবলরাম জানতে পারলেন। যখন তিনি শুনলেন যে রাজকুমারীকে হরণ করবার জন্য ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ একলা গিয়েছেন তখন তাঁর ভ্রাতৃস্নেহ আন্দোলিত হল। যুদ্ধের আশঙ্কা আছে জেনে তিনি গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিক যুক্ত চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে কুণ্ডিনপুর যাত্রা করলেন।

এদিকে পরমাসুন্দরী রুক্মিণীদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। রুক্মিণীদেবী চিন্তিত হয়ে পড়লেন কারণ সেই বার্তাবহ ব্রাহ্মণদেবতা তখনও ফিরে আসেননি। রুক্মিণীদেবী ভাবছেন—'আর মাত্র এক রাত বাকি। আমার জীবনবল্লভ কমলনয়ন শ্রীভগবান এখনও এলেন না ! কী কারণ হতে পারে ? কিছু তো বোঝাও যাচ্ছে না ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ পরম শুদ্ধ আর বিশুদ্ধ পুরুষই তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক রাখতে পারে। তাহলে কি দেবী গিরিজা আমার উপর রুষ্ট হয়েছেন।' তবুও অপেক্ষা না করে উপায় নেই। হঠাৎ তিনি বাম অঙ্গে শুভ সংকেত প্রকম্পন অনুভব করলেন। এই সময়েই ব্রাহ্মণদেবতার আগমন হল। রুক্মিণীদেবীকে তাঁর ধ্যানমগ্না দেবী মনে হল। রুক্মিণীদেবী দূর থেকে লক্ষ করলেন যে ব্রাহ্মণদেবতা প্রসন্নবদন। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরই ব্রাহ্মণদেবতার মুখে সেই কথাই তিনি শুনতে

পেলেন। ব্রাহ্মণদেবতা জানালেন—'হে রাজনন্দিনী ! আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সত্য প্রতিজ্ঞ।' রুক্মিণীদেবীর অন্তর আনন্দে ভরে উঠল। তার বিনিময়ে ব্রাহ্মণের জন্য শ্রীভগবান ছাড়া আর কিছুই প্রিয় নয় জেনে তিনি ব্রাহ্মণ দেবতাকে কেবল নমস্কার করলেন। অর্থাৎ জগতের সমগ্র লক্ষ্মী ব্রাহ্মণদেবতাকে অর্পণ করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের আগমন বার্তা রাজা ভীষ্মকও পেলেন। তিনি তূরী, ভেরি ও পূজাসামগ্রী নিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন আর মধুপর্ক, নির্মল বস্ত্র ও উত্তম উপঢৌকন আদি দান করে তাঁদের পূজার্চনা করলেন। ভক্ত রাজাভীষ্মক তাঁদের সৈন্য ও সহচর সহিত উৎকৃষ্ট নিবাস স্থান দিলেন।

**কৃষ্ণমাগতমাকর্ণ্য বিদর্ভপুরবাসিনঃ।**
**আগত্য নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুস্তন্মুখপঙ্কজম্‌॥**

(১০।৫৩।৩৬)

বিদর্ভ দেশের নাগরিকবৃন্দ যখন শুনল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন হয়েছে তখন তারা দলে দলে শ্রীভগবানের নিবাসস্থানে এল আর নয়নের অঞ্জলি পূর্ণ করে তাঁর শ্রীবদনের মধুর মকরন্দ সুধা রস পান করতে লাগল।

**অস্যৈব ভার্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরা।**
**অসাবপ্যনবদ্যাত্মা ভৈষ্ম্যাঃ সমুচিতঃ পতিঃ॥**

(১০।৫৩।৩৭)

তারা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছিল—রুক্মিণী এঁরই অর্ধাঙ্গিনী হওয়ার উপযুক্ত আর এই পরম পবিত্রমূর্তি শ্যামসুন্দর রুক্মিণীরই যোগ্য পতি।

এমন সময়ে রুক্মিণীদেবী অন্তঃপুর থেকে বেরোলেন আর সুরক্ষিত হয়ে দেবীর মন্দিরে চললেন। তিনি প্রেমমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মে নিত্যযুক্ত হয়ে ভগবতী ভবানীর মন্দির অভিমুখে পদব্রজে চললেন। শোভাযাত্রায় মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ঢোল, তূরী ও ভেরি আদি বাদ্য বাজছিল। সঙ্গে ব্রাহ্মণপত্নীগণ পুষ্পমাল্য, চন্দন আদি সুগন্ধ দ্রব্যাদি ও বস্ত্রালংকারে

সুসজ্জিত হয়ে সঙ্গে চলছিলেন। গীত, বাদ্য, জয়ধ্বনি সবই হতে লাগল।

দেবী ভবানীর মন্দিরে উপনীত হয়ে রুক্মিণীদেবী তাঁর কমলসম সুকোমল হস্তপদাদি প্রক্ষালন, আচমন করে পবিত্র হয়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। বহু বিধি ও বিধানের জ্ঞাতা ব্রাহ্মণ পত্নীগণ দেবী ভবানী ও ভগবান শ্রীশঙ্করকে রুক্মিণীকে দিয়ে প্রণাম ও পূজা করালেন।

**নমস্যে ত্বামিকেঽভীক্ষ্ণং স্বসন্তানযুতাং শিবাম্।**
**ভূয়াৎ পতির্মে ভগবান্ কৃস্ণস্তদনুমোদতাম্॥**
(১০।৫৩।৪৬)

রুক্মিণীদেবী ভগবতীকে প্রার্থনা করলেন— হে অম্বিকামাতা ! যুগলে আপনি ও আপনার অঙ্কে উপবিষ্ট প্রিয় পুত্র শ্রীগণেশ আমার বার বার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি আশীর্বাদ দিন যেন আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমার পতি হন।

অতঃপর তিনি জল, গন্ধ, অক্ষত, ধূপ, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য, হার, আভরণ, বহু রকমের নৈবেদ্য, উপঢৌকন ও আরতি আদি সামগ্রী দ্বারা অম্বিকাদেবীর পূজা করলেন। তিনি বিবিধ সামগ্রী দ্বারা ব্রাহ্মণপত্নীগণেরও পূজা করলেন। আশীর্বাদ প্রসাদ ধারণ আদির পর রত্নময় অঙ্গুরীয় যুক্ত করকমল দ্বারা সখীর হস্ত ধারণ করে রুক্মিণীদেবী গিরিজামন্দিরের বাইরে এলেন।

**তাং দেবমায়ামিব বীরমোহিনীং**
**সুমধ্যানাং কুণ্ডলমণ্ডিতাননাম্।**
**শ্যামাং নিতম্বার্পিতরত্নমেখলাং**
**ব্যঞ্জৎ স্তনীং কুন্তলশঙ্কিতেক্ষণাম্॥** (১০।৫৩।৫১)

রূপে রুক্মিণীদেবী ভগবানের মায়াসম বড় বড় ধীর বীরদেরও মোহিত করতে সক্ষম ছিলেন। তাঁর কটিদেশ ছিল ক্ষীণ ও সুন্দর। বদনমণ্ডলে কর্ণকুণ্ডলের দীপ্তি ছড়িয়ে ছিল। তিনি কৈশোর ও তরুণ অবস্থার সন্ধিতে স্থিত ছিলেন। নিতম্বে রত্নমণ্ডিত চন্দ্রহার শোভমান ছিল। তাঁর উন্নত বক্ষঃস্থল ছিল আর তাঁর দৃষ্টি দোদুল্যমান অলকাবলির জন্য চঞ্চল লাগছিল।

এককথায় তিনি রূপে আলোকিত হয়ে মাতা গিরিজার আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে মন্দিরের বাইরে এলেন।

রমা তখন রমাপতির সঙ্গে মিলনের প্রতীক্ষায় তাঁর অসামান্য রূপের ডালা মেলে ধরেছিলেন। তাঁর মায়া মোহিনীরূপের অঙ্গ ছিল ওষ্ঠে মনোহর স্মিতহাস্য, সুউজ্জ্বল কুন্দকলি সম শিখরদশন, পক্কবিম্বাধরওষ্ঠের লালিমা দীপ্তি। তাঁর চরণের পায়জরের এক ভিন্ন সৌন্দর্য ছিল, সেই জ্যোতির্ময় আভরণের ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমূহে রুনুঝুনু শব্দ হচ্ছিল। তাঁর চলন ছিল রাজহংস গতিতে। রুক্মিণীদেবীর অনুপম সৌন্দর্য মাধুর্য প্রত্যক্ষ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত বড় বড় বীর যশস্বীগণ মোহিত হয়ে পড়ল। কন্দর্প উপযুক্ত সময় বিচার করে পুষ্পশর নিক্ষেপ করে সকলকে অভিভূত করে ফেললেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত রূপ সম্ভারে মোহিত হয়ে নৃপতিগণ যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল। মৃদুহাস্য ও সলজ্জ দৃষ্টি দেখেই সকলের হাত থেকে অস্ত্রশস্ত্র সকল ভূমিতে পড়ে গেল ; এমনকী তারাও নিজ নিজ বাহন রথ, গজ, অশ্ব আদি থেকে নিজেকে সামলাতে সক্ষম না হয়ে ভূমিতে আছড়ে পড়ল।

**সৈবং শনৈশ্চলয়তী চলপদ্মকোশৌ**
**প্রাপ্তিং তদা ভগবতঃ প্রসমীক্ষমাণা।**
**উৎকার্য বামকরজৈরলকানপাঙ্গৈঃ**
**প্রাপ্তান্ হ্রিয়ৈক্ষত নৃপান্ দদৃশেঽচ্যুতং সা।।** (১০।৫৩।৫৪)

এইভাবে রুক্মিণীদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমনের আশায় নিজ কমলকলিসম সুকুমার চরণে এগিয়ে চললেন। তাঁর দোদুল্যমান অলকবল বদনমণ্ডলকে খানিকটা ঢেকে রেখেছিল। তিনি বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বারা অলকাবলি সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টিপথ বাধা মুক্ত করতেই তাঁর সলজ্জ দৃষ্টি নৃপতিদের উপর গিয়ে পড়ল। এমন সময়েই তাঁর দৃষ্টি শ্যামসুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপরও পড়ল।

**তাং রাজকন্যাং রথমারুরুক্ষতীং**
**জহার কৃষ্ণো দ্বিষতাং সমীক্ষতাম্।**

**রথং সমারোপ্য সুপর্ণলক্ষণং**
**রাজন্যচক্রং পরিভূয় মাধবঃ॥** (১০।৫৩।৫৫)

রাজকুমারী রুক্মিণীদেবী রথে চড়তে যাচ্ছিলেন। তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শত্রুদের চোখের সামনেই সেই জনাকীর্ণ স্থানে রুক্মিণীদেবীকে রথে তুলে নিলেন আর সেই শত শত নৃপতিদের মস্তকে চরণ স্থাপন করে তাঁকে নিজ রথে বসিয়ে নিলেন। রথের ধ্বজা গরুড় চিহ্নে শোভিত ছিল।

**ততো যযৌ রামপুরোগমৈঃ শনৈঃ**
**সৃগানমধ্যাদিব ভাগহৃদ্ধরিঃ॥** (১০।৫৩।৫৬)

এর পর সিংহ যেমন শৃগালদের মধ্য থেকে নিজের ভাগ নিয়ে যায় তেমনভাবেই রুক্মিণীদেবীকে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম আদি যদুবংশজাতগণ সেইখান থেকে সরে গেলেন।

ঘটনা এত আচমকা ঘটল যে জরাসন্ধাদি অহংকারী রাজাগণ হতবাক হয়ে তা দেখল আর পরে ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তারা বলে উঠল—ধিক ! আমাদের পৌরুষ ! আজ আমরা ধনুক নিয়ে দাঁড়িয়েই থেকে গেলাম। আমাদের মতন সিংহের গ্রাস সম শৌর্যবীর্যসম্ভার যেন এক হরিণ কেড়ে নিয়ে গেল।

———○———

# শ্রীনিবাস

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকনন্দিনীকে রথে তুলে নিয়ে চলেছেন। উপস্থিত বীর নৃপতিগণ কিছুক্ষণ হতবাক থেকে কুপিত হয়ে নিজ নিজ বাহনে আরূঢ় হয়ে বর্ম আদি ধারণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগল। যদুবংশের সেনাপতিগণও নিজ নিজ ধনুকে টঙ্কার দিয়ে রুখে দাঁড়াল। জরাসন্ধের সৈন্য সকলেই ধনুর্বিদ্যায় কুশল তাই তারা মুহুর্মুহু শরবর্ষণ করতে লাগল ; মনে হল যেন বিশাল মেঘরাজি পর্বতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করছে।

পরমাসুন্দরী রুক্মিণীদেবী দেখলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৈন্যদল শরবর্ষণে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। তখন তিনি ভীত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকালেন। শ্রীভগবান হেসে বললেন — সুন্দরী ! ভয় নেই। তোমার সৈন্যদলও এইবারে শত্রু সৈন্য তছনছ করে দেবে। শত্রুপক্ষের এই পরাক্রম প্রদর্শন যদুবংশজাত বীর গদ ও সঙ্কর্ষণের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হল না। শত্রুসৈন্য নির্মূল হতে সময় লাগল না। জরাসন্ধাদি রাজারাও পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করল।

শিশুপালের তখন করুণ অবস্থা। কান্তিহীন অবসন্ন দেহে তখন সে অর্ধমৃত। জরাসন্ধ তাকে বোঝাল—এইবার কাল অনুকূল বলে তারা জিতেছে। যখন তা আমাদের অনুকূল হবে তখন আমরা জিতব। যে সকল নৃপতি তখনও বেঁচে ছিল তারা ফিরে চলল। চেদিরাজ শিশুপাল সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে নিজ রাজধানীতে ফিরে চলল।

রুক্মিণীদেবীর অগ্রজ রুক্মী কিন্তু এই অপমান সহ্য করে নিতে রাজি হল না। সে নিজে কৃষ্ণদ্বেষী আর তার সামনেই সেই শ্রীকৃষ্ণই তার সহোদরাকে হরণ করে নিয়ে গেল— এই কথা সহ্য নেওয়া তার পক্ষে কঠিন হল। রুক্মী নিজেও বলবান ছিল। সে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করল। রুক্মী আবার গমনের পূর্বে বর্ম ও ধনুর্বাণ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করে বসল যে সফল না হলে সে রাজধানী কুণ্ডিন নগরে প্রবেশ করবে না।

সে ঘটনাস্থলে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরাঘাতে তার ধনুকসকল, রথ ধ্বজ, সারথি সবই ছেদন করলেন।

রুক্মীর পরিঘ, পট্টিশ, শূল, ঢাল, তরবারি, শক্তি ও তোমর অস্ত্রশস্ত্র সকল ব্যবহারের পূর্বেই ধ্বংস হল। সক্রোধে রুক্মী তরবারি নিয়ে ছুটে গেল কিন্তু শ্রীভগবানের শরবর্ষণে ঢাল-তরবারি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা রুক্মীকে বধ করতে উদ্যত হলেন তখন ভয়ে বিহ্বল রুক্মিণীদেবী প্রিয়তমের কাছে অগ্রজের প্রাণ ভিক্ষা করলেন।

**যোগেশ্বরাপ্রেময়াত্মন্ দেবদেব জগৎপতে।**
**হন্তুংনার্হসি কল্যাণ ভ্রাতরং মে মহাভুজ॥** (১০।৫৪।৩৩)

হে দেবাদিদেব জগৎপতি! আপনি যোগেশ্বর। আপনার স্বরূপ ও ইচ্ছা সকলের অজানা। আপনি অমিত বিক্রম ও কল্যাণবিগ্রহ। আমার ভ্রাতাকে বধ করা আপনার যোগ্য কর্ম নয়।

রুক্মিণীদেবী তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলেন। ভয়, উৎকণ্ঠায় তিনি বাকশক্তি হারিয়েছিলেন। তাঁর সুবর্ণনির্মিত কণ্ঠহার খুলে গিয়েছিল। তিনি সেই অবস্থাতেও ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করেছিলেন। পরম করুণাময় শ্রীভগবান রুক্মীকে বধ করলেন না। তিনি রুক্মীকে দোপাট্টা দিয়ে বেঁধে অসমান ভাবে কেশ, শ্মশ্রু-গুম্ফা কামিয়ে তাকে হাস্যকর করে দিলেন। তখন দেখা গেল যে রুক্মীর সৈন্যও যদুবংশের সৈন্যদের হাতে পর্যুদস্ত হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্য ভগবান শ্রীবলরামের ভালো লাগল না ; তাঁর ইচ্ছায় রুক্মী মুক্তি পেল। সে রাজধানী কুণ্ডিননগরে ফিরে না গিয়ে ভোজকট নগর স্থাপনা করে সন্তপ্ত হৃদয়ে বসবাস করতে লাগল। সে পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করে রেখেছিল যে দুর্বুদ্ধি কৃষ্ণকে নিহত করে এবং বোন রুক্মিণীকে সঙ্গে না নিয়ে সে কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করবে না।

**ভগবান ভীষ্মকসুতামেবং নির্জিত্য ভূমিপান্।**
**পুরমানীয় বিধিবদুপয়েমে কুরূদ্বহ॥** (১০।৫৪।৫৩)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে সকল নৃপতিদের পরাভূত করে বিদর্ভ-রাজকুমারী রুক্মিণীদেবীকে দ্বারকায় এনে তাঁকে পূর্ণরীতিতে বিবাহ করলেন।

**তদা মহোৎসবো নৃণাং যদুপর্যাং গৃহে গৃহে।**
**অভূদনন্যভাবানাং কৃষ্ণে যদুপত্রৌ নৃপ॥** (১০।৫৪।৫৪)

দ্বারকাপুরীতে ঘরে ঘরে উৎসব পালন শুরু হয়ে গেল কারণ তাদের যে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য প্রীতি ছিল।

নরা নার্য্যশ্চ মুদিতাঃ প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।
পারিবর্হমুপাজহুর্বরয়োশ্চিত্রবাসসোঃ ॥ (১০।৫৪।৫৫)

সেইখানকার সকল নরনারী মণিময়কুণ্ডল ধারণ করে ছিলেন। তারা আনন্দে চিত্রবিচিত্র বস্ত্র ধারণ করে নব বরবধূর জন্য বহু উপহার সামগ্রী দান করল।

তখন দ্বারকার সৌন্দর্য বর্ণনাতীত মনোহর ছিল। বহু স্থানে বৃহৎ পতাকা-বৃন্দ মুক্ত গগনে পতপত করে উড়ে দ্বারকার আনন্দকে ঘোষণা করছিল। নগরের বহু স্থানে চিত্রবিচিত্র তোরণ রচনা করা হয়েছিল যাতে বস্ত্র ও রত্নের সজ্জা যুক্ত করে তা দৃষ্টিনন্দন করা হয়েছিল। দ্বারকার গৃহ সমূহের দ্বারে দূর্বা, ডাব, আম্রপল্লব যুক্ত মঙ্গলঘট সুসজ্জিত করা ছিল। জলে পূর্ণ ঘট অর্থাৎ পূর্ণকুম্ভ, অগুরু, ধূপের সুগন্ধ ও দীপসমূহের দীপ্তি আদিরও অনুপম শোভা ছিল।

সিক্তমার্গা মদচ্যুদ্ভিরাহূতপ্রেষ্ঠভূভুজাম্।
গজৈর্দ্বাস্সু পরামৃষ্টরম্ভা পূগোপশোভিতা॥ (১০।৫৪।৫৭)

মিত্র নৃপতিগণ সেই বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের মদস্রাবী গজসমূহের মদক্ষরণে দ্বারকার রাজপথ ও গলিপথ সিক্ত হয়ে গেল। গৃহদ্বারে কদলীবৃক্ষ ও সুপারিবৃক্ষ প্রোথিত থাকায় তা সুন্দর মনে হচ্ছিল।

সেই উৎসবে ঔৎসুক্যবশত চতুর্দিকে সকলে ছুটাছুটি করছিল। সেই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকয়, বিদর্ভ, যদু ও কুন্তি আদি বংশের লোকেরাও ছিল।

রুক্মিণ্যা হরণং শ্রুত্বা গীয়মানং ততস্ততঃ।
রাজানো রাজকন্যাশ্চ বভূবুর্ভৃশবিস্মিতাঃ॥ (১০।৫৪।৫৯)

সর্বত্র রুক্মিণী হরণ লীলা সংকীর্তন হতে লাগল। সমাগত রাজাগণ ও রাজনন্দিনীগণ তা সবিস্ময়ে শ্রবণ করে ধন্য হয়ে গেলেন।

দ্বারকায়ামভূদ্ রাজন্ মহামোদঃ পুরৌকসাম্।
রুক্মিণ্যা রময়োপেতং দৃষ্টা কৃষ্ণং শ্রিয়ঃ পতিম্॥ (১০।৫৪।৫৯)

ভগবতী লক্ষ্মীদেবীকে রুক্মিণী রূপে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুগলে প্রত্যক্ষ করে দ্বারকাবাসী জনগণ ধন্য হয়ে গেল।

———o———

# প্রদ্যুম্ন

কামস্তু বাসুদেবাংশো দগ্ধঃ প্রাগ্ রুদ্রমন্যুনা।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রত্যপদ্যত॥
(১০।৫৫।১)

কামদেব ভগবান বাসুদেবেরই অংশ। তিনি পূর্বে ভবগান শ্রীশংকরের ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন। পুনরায় দেহপ্রাপ্তির জন্য তিনি নিজ অংশ বাসুদেবকেই আশ্রয় করলেন।

সেই কামদেবই বিদর্ভরাজনন্দিনী রুক্মিণীর গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়ে প্রদ্যুম্ন নামে প্রসিদ্ধ হলেন। তিনি সৌন্দর্য, বীর্য, সৌশীল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না। যখন সূতিকাগারে শিশু প্রদ্যুম্ন মাত্র দশ দিনের তখন এক ঘটনা ঘটল। ইচ্ছামতন রূপধারণে সমর্থ শম্বরাসুর জানতে পারল যে তার ভবিষ্যতের শত্রু জন্মগ্রহণ করেছে। তাই সে মায়ারূপ ধারণ করে সূতিকাগার থেকে শিশু প্রদ্যুম্নকে হরণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে গৃহে ফিরে গেল।

সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত শিশুকে এক বিশাল মৎস্য গিলে ফেলল। তদনন্তর ধীবরগণের বড় জালে সেই বিশাল মৎস্য অন্যান্য মৎস্যের সঙ্গে ধরা পড়ল। ধীবরগণ সেই বিশাল মৎস্য শম্বরাসুরকে উপহার হিসেবে দিয়ে দিল। শম্বরাসুর সেই অদ্ভুত বিশাল মৎস্যকে পাচকদের দিলে তারা তা পাকশালায় নিয়ে এল আর ধারালো ছুরি দিয়ে সেটি কাটতে লাগল।

দৃষ্ট্বা তদুদরে বালিং মায়াবতৈ ন্যবেদয়ন্।
নারদোঽকথয়ৎ সর্বং তস্যাঃ শঙ্কিতচেতসঃ।
বালস্য তত্ত্বমুৎপত্তিং মৎস্যোদরনিবেশনম্॥
(১০।৫৫।৬)

পাচকগণ মৎস্যের উদরে এক বালককে দেখে তা শম্বরাসুরের দাসী মায়াবতীকে অর্পণ করল। শিশুকে দর্শন করে দাসী মায়াবতী শঙ্কিত হয়ে

পড়ল। দেবর্ষি নারদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শিশু যে কামদেব স্বয়ং এবং শ্রীকৃষ্ণের ভার্যা রুক্মিণীর গর্ভজাত আর শম্বরাসুর দ্বারা সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়ে মৎস্যের উদরে গমন—এই সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত মায়াবতীকে বললেন।

এই মায়াবতী কামদেবেরই যশোস্বিনী পত্নী রতি ছিলেন। ভগবান শ্রীশংকরের ক্রোধাগ্নিতে যখন কামদেবের দেহ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল সেই দিন থেকে রতি কামদেবের পুনরাগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শম্বরাসুর রতিকে পাচিকারূপে নিযুক্ত করে রেখেছিল। দেবর্ষি নারদের কাছে জানতে পারে যে শিশুরূপে স্বয়ং তাঁর পতিদেবতা কামদেব এসেছেন, তখন শিশুর প্রতি তিনি প্রেমভাব পোষণ করতে লাগলেন।

**নাতিদীর্ঘেণ কালেন স কার্ষ্ণী রূঢ়যৌবনঃ।**
**জনমায়াস নারীণাং বীক্ষন্তীনাং চ বিভ্রমম্॥**

(১০।৫৫।৯)

শ্রীকৃষ্ণনন্দন ভগবান প্রদ্যুম্ন অল্পকালের মধ্যেই যৌবনে পদার্পণ করলেন। তাঁর রূপলাবণ্য এত বেশি ছিল যে কোন রমণীর দৃষ্টি পড়লেই তার মনে শৃঙ্গার রসের উদ্দীপন হয়ে যেত।

**সা তং পতিং পদ্মদলায়তেক্ষণং প্রলম্ববাহুং নরলোকসুন্দরম্।**
**সব্রীড়হাসোত্তভিতভ্রুবেক্ষতী প্রীত্যোপতস্থে রতিরঙ্গ সৌরতৈঃ॥**

(১০।৫৫।১০)

কমলদলসম কোমল আয়তলোচন আজানুলম্বিত বাহু অনিন্দসুন্দর নরদেহে যেন মূর্তিমান সৌন্দর্য ছিল। রতি সলজ্জ হাস্য ভ্রূভঙ্গী সহকারে তাঁর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলেন আর প্রীতি সহকারে কাম ভাব প্রদর্শন করে পতিদেবতার সেবা-যত্ন করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণনন্দন ভগবান প্রদ্যুম্ন রতির মনের ভাবে পরিবর্তন লক্ষ করে বললেন—দেবী ! মাতৃসম তুমি। বুদ্ধিবৈকল্য ঘটল কেন ? মাতৃভাব ত্যাগ করে কামিনীভাব প্রদর্শন কেন ?

রতি তখন ভগবান প্রদ্যুম্নকে বললেন—প্রভু ! আপনি স্বয়ং ভগবান নারায়ণের পুত্র। শম্বরাসুর আপনাকে সূতিকাগার থেকে হরণ করেছিল। আপনি আমার পতিদেবতা কামদেব আর আমি আপনার জন্মজন্মান্তরের

ভার্যা রতি। যখন আপনি মাত্র দশ দিনের তখন শম্বরাসুর আপনাকে হরণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছিল। এক বিশাল মৎস্য আপনাকে গ্রাস করেছিল ও তারই উদরের মধ্যে থাকায় আপনি আমাদের কাছে এসেছেন। এই শম্বরাসুর শত শত মায়া জানে। তাকে বশীভূত করা অথবা পরাজিত করা অতিশয় কঠিন কার্য। আপনি এই শম্বরাসুরকে মোহন আদি মায়া দ্বারা বিনাশ করুন। আপনার মাতা রুক্মিণীদেবী বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হয়ে কুররী পক্ষীর ন্যায় দিবারাত্র রোদন করছেন। সন্তান ছাড়া কি মাতা থাকতে পারে ?

**প্রভাষ্যৈবং দদৌ বিদ্যাং প্রদ্যুম্নায় মহাত্মনে।**
**মায়াবতী মহামায়াং সর্বমায়াবিনাশিনীম্॥**

(১০।৫৫।১৬)

মায়াবতী রতি এইভাবে অমিত বিক্রমকে মহামায়া নামক বিদ্যা প্রদান করলেন। এই বিদ্যা সর্বপ্রকারের মায়াকে বিনাশ করতে সক্ষম হয়ে থাকে।

সর্বমায়াবিনাশিনী মহামায়া বিদ্যা লাভ করে দুর্দমনীয় পরাক্রমী শ্রীপ্রদ্যুম্ন এইবার শম্বরাসুরের কাছে গমন করে তার প্রতি বজ্রপাতসম কঠোর বাক্য প্রয়োগ করতে লাগলেন। শম্বরাসুরকে উত্তেজিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর তিনি শত্রুকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্নর কটূক্তিতে শম্বরাসুর পদাহত সর্পসম উঠে দাঁড়ালো। ক্রোধে তার চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। সে গদা হাতে বাইরে বেরিয়ে এল এবং গদা ঘুরিয়ে কর্কশ সিংহনাদ করে শ্রীপ্রদ্যুম্নের উপর তা নিক্ষেপ করল ; বজ্রপাতসম শব্দে আকাশবাতাস কেঁপে উঠল। ভগবান প্রদ্যুম্ন দেখলেন যে নিক্ষিপ্ত গদা প্রচণ্ড বেগে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। তিনি নিজ গদা দ্বারা তা প্রতিহত করে সক্রোধে শত্রুর উপর নিজ গদা চালনা করলেন। তখন শম্বরাসুর দৈত্য ময়ের কাছ থেকে শেখা আসুরী মায়ার সাহায্যে আকাশে মিলিয়ে গিয়ে মহারথ শ্রীপ্রদ্যুম্নের উপর অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। এইবার তার উত্তরে ভগবান শ্রীপ্রদ্যুম্ন সকল মায়াকে বিনাশ করবার জন্য নিজ মহামায়া বিদ্যা প্রয়োগ করলেন। অতঃপর শম্বরাসুর যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসদের শত শত মায়া প্রয়োগ করল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকুমার শ্রীপ্রদ্যুম্ন নিজ মহাবিদ্যা দ্বারা সকলই প্রতিহত করলেন। এইবার তিনি সুতীক্ষ্ণ তরবারি তুলে নিলেন আর

শম্বরাসুরের তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফ ও কিরীট-কুণ্ডলযুক্ত ভয়ংকর মস্তককে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

শম্বরাসুর বধ হওয়াতে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। মায়াবতী রতি আকাশ পথে গমন করতে পারতেন। তিনি নিজ পতি শ্রীপ্রদ্যুম্নকে আকাশ পথে দ্বারকা নিয়ে চললেন। আকাশ পথে যখন রতি তাঁর পতিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেই শুভ্র-শ্যাম যুগল মূর্তি বিদ্যুন্মালায় সুশোভিত মেঘ সম শোভমান হয়েছিল। এইভাবে তাঁরা শ্রীভগবানের সেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করে গেলেন যেখানে শত শত শ্রেষ্ঠ রমণীগণ নিবাস করতেন।

**তং দৃষ্ট্বা জলদশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।**
**প্রলম্ববাহুং তাম্রাক্ষং সুস্মিতং রুচিরাননম্॥**
**স্বলঙ্কৃতমুখাম্ভোজং নীলবক্রালকালিভিঃ।**
**কৃষ্ণং মত্বা স্ত্রিয়ো হ্রীতা নিলিল্যুস্তত্র তত্র হ॥**

(১০।৫৫।২৭-২৮)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে উপস্থিত শ্রীপ্রদ্যুম্নের উপর অন্তঃপুর-বাসীদের দৃষ্টি পড়ল। তাঁরা দেখলেন যে নবনীরদঅঙ্গ শ্যামসুন্দর স্বয়ং উপস্থিত। তাঁর অঙ্গে কৌষেয় পীতাম্বর। তিনি আজানুলম্বিত বাহু। অরুণাভলোচন, মৃদুমন্দহাস্য সমৃদ্ধ অধরযুক্ত। তাঁর মুখারবিন্দের উপর নীলবর্ণ কুঞ্চিত কেশদামের সৌন্দর্য যা দেখে ক্রীড়ারত ভ্রমরদের মনে পড়ে যায়। ভগবান শ্রীপ্রদ্যুম্নকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনে করে তাঁরা তাঁর সম্মুখ থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে পড়লেন।

ধীরে ধীরে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ নন। কিছু অমিল তাঁদের চোখে ধরা পড়েছিল। তখন তারা এই অনিন্দ্যসুন্দর যুগলের কাছে আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে ছুটে এলেন। তখনই ঘটনাস্থলে রুক্মিণীদেবীর আগমন হল। নীলবর্ণ নেত্রপ্রান্তবিশিষ্টা মধুরভাষিণী রুক্মিণীদেবীর দৃষ্টি এই দিব্য দম্পতির উপর পড়তেই তা নিজ হারিয়ে যাওয়া পুত্রের কথা মনে করিয়ে দিল। বাৎসল্য স্নেহাধিক্যে তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধক্ষরণ হতে লাগল। তাঁর মনে হতে লাগল যেন এই সেই শিশু যাকে তিনি সূতিকাগার থেকে জন্মদানের দশ দিনের মাথায় হারিয়েছিলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে শ্রীপ্রদ্যুম্নকে

দেখতে লাগলেন। বিগ্রহ, অঙ্গসকল, চলন-বলন, হাস্য, দৃষ্টিপাত সবই ভগবান শ্যামসুন্দরের অনুরূপ হল কেমন করে ? এইরূপ যখন তিনি চিন্তা করলেন তখন তিনি বাম অঙ্গে মঙ্গলজনক প্রকম্পন অনুভূতি লাভ করলেন।

সন্দেহের দোলায় দোলায়মান রুক্মিণীদেবীর কাছে এইবার পবিত্র কীর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর জনক-জননী শ্রীবসুদেব ও দেবকীর আগমন হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো অন্তর্যামী, তাই সব কথাই জানেন কিন্তু তিনি নিজে কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এইবার ঘটনাস্থলে দেবর্ষি নারদের প্রবেশ ঘটল। তিনিই আদ্যোপান্ত ঘটনা বৃত্তান্ত সকলকে জানালেন। দেবর্ষি নারদ কথিত আশ্চর্যজনক ঘটনা শ্রবণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুর-বাসীগণ হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁরা সকলে শ্রীপ্রদ্যুম্নকে অভিনন্দিত করলেন। এ যেন মৃত ব্যক্তির প্রাণ ফিরে পাওয়ার মতন ঘটনা হল। দেবকীদেবী, শ্রীবসুদেব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীবলরাম, রুক্মিণীদেবী ও রমণীগণ নবদম্পতিকে আলিঙ্গন দান করে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেলেন।

দ্বারকার জনগণ জানতে পারল যে হারিয়ে যাওয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন ফিরে এসেছেন। যাঁকে ফিরে পাওয়ার কোনো আশা ছিল না তাঁকে ফিরে পাওয়ার অনুভূতি যে কি তা বুঝিয়ে বলা কঠিন।

**যং বৈ মুহুঃ পিতৃসরূপনিজেশভাবা-**
**স্তন্মাতরো যদ্‌ভজন্ রহরূঢ়ভাবাঃ।**
**চিত্রং ন তৎ খলু রমাস্পদবিম্ববিম্বে**
**কামে স্মরেঽক্ষিবিষয়ে কিমুতান্যনার্যঃ॥**

(১০।৫৫।৪০)

প্রায় সর্বাংশে পিতার অনুরূপ বলে রুক্মিণীদেবী ছাড়া অন্যান্য মাতাগণ শ্রীপ্রদ্যুম্নকে দেখে নিজ পতিদেবতা জ্ঞান করে মধুরভাবে মগ্ন হয়ে তাঁর সম্মুখ থেকে সরে যেতেন। শ্রীনিকেতন ভগবানের প্রতিবিম্বস্বরূপ কামাবতার ভগবান প্রদ্যুম্নের সঙ্গে দেখা হলে এইরূপ হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। তখন অন্যান্য রমণীদের যে বিচিত্র অবস্থা হোত তা তো সহজেই অনুমেয়।

———০———

# স্যমন্তকমণি উপাখ্যান

সত্রাজিৎ ভগবান সূর্যের অতি বড় ভক্ত ছিল। ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে ভগবান সূর্য তাকে স্যমন্তকমণি দিয়েছিলেন। সত্রাজিৎ সেই মণিগলায় ধারণ করে বিচরণ করত। জ্যোতির্ময় স্যমন্তক মণি ধারণ করাতে লোকে তাকে সূর্য বলেই মনে করত। সত্রাজিৎ দ্বারকায় এলে জ্যোতির্ময় স্যমন্তকমণির আলোকে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় লোকে তাকে চিনতে পারল না। জনগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে বলল—হে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী নারায়ণ ! হে কমলনয়ন ! হে দামোদর ! হে গোবিন্দ ! হে যদুনন্দন ! আপনাকে প্রণাম। হে জগদীশ্বর ! দেখুন। নিজ প্রচণ্ড আলোকোজ্জ্বল তনু ভগবান সূর্য আপনাকে দর্শন করতে আসছেন।

তাদের কথা শ্রবণ করে কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন আর বললেন—সূর্য ! কোথায় ? এ তো সত্রাজিৎ। ও মণি ধারণ করে আছে বলে জ্যোতির্ময় মনে হচ্ছে।

সত্রাজিৎ গৃহে ফিরে এল। সেখানে উৎসব পরিবেশ সৃষ্ট হল। সে ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্যমন্তকমণিকে দেবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করল। স্যমন্তকমণির বিশেষত্ব ছিল যে তা পূজিত হতে থাকলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গ্রহবিপাক, সর্পভয়, মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি, মায়াবী উপদ্রব আদি অশুভ কিছুই ঘটে না। একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—সত্রাজিৎ ! তুমি ওই স্যমন্তকমণি রাজা উগ্রসেনকে দিয়ে দাও। তাতে সমগ্র রাষ্ট্রের কল্যাণ হবে। লোভী সত্রাজিৎ শ্রীভগবানের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিলনা আর তা নিজের কাছেই রেখে দিল।

একদিন সত্রাজিতের অনুজ প্রসেন সেই জ্যোতির্ময় স্যমন্তকমণি গলায় পরে অশ্বারোহণে অরণ্য মধ্যে মৃগয়ায় গমন করল। অরণ্যে সিংহের আক্রমণে প্রসেন প্রাণ দিল আর সিংহ সেই স্যমন্তক মণি কেড়ে নিল ও সেটি নিয়ে পর্বত কন্দরে যখন প্রবেশ করল তার তখনই স্যমন্তকমণির জন্য

ঋক্ষরাজ জাম্বুবান তাকে বধ করলেন। জাম্ববান সেই মণি নিয়ে গিয়ে তাঁর শিশুকে খেলা করবার জন্য দিলেন। প্রসেন ফিরে না আসায় তার অগ্রজ সত্রাজিৎ স্যমন্তক মণির জন্য প্রসেনকে হত্যা করবার অভিযোগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর আরোপ করল। লোকমুখে সেই কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কানেও উঠল। তিনি কলঙ্ক মোচনের জন্য নগরের কিছু মান্যগণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে প্রসেনকে খুঁজে বার করবার জন্য অরণ্যে গমন করলেন। অরণ্যে বিচরণ করতে করতে দেখা গেল যে গভীর অরণ্যে সিংহের হাতে প্রসেন ও তার অশ্ব নিহত হয়েছে। সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করে যেতে জনগণ দেখল যে এক পর্বত কন্দরের সম্মুখে সিংহ এক ঋক্ষের হস্তে বধ হয়ে পড়ে আছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গের লোকজনদের কন্দরের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে একা সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে পরিপূর্ণ ঋক্ষরাজের ভয়ংকর গুহায় প্রবেশ করলেন। শ্রীভগবান দেখলেন যে সেই মহামূল্য স্যমন্তকমণি নিয়ে একটি শিশু খেলা করছে। স্যমন্তক মণি শিশুর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য তার কাছে যেতেই অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে শিশুটি ভয়ে চিৎকার করে উঠল। তার চিৎকার শ্রবণ করে পরম শক্তিমান ঋক্ষরাজ জাম্বুবান সক্রোধে সেইখানে দৌড়ে এলেন। কুপিত ঋক্ষরাজ শ্রীভগবানের মহিমা ও প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। তিনি শ্রীভগবানকে এক সাধারণ ব্যক্তি জ্ঞানে শত্রুভাবে দেখে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অস্ত্র, শিলা, উৎপাটিত বৃক্ষ দ্বারা যুদ্ধ হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে শ্রীভগবানের ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধ অষ্টবিংশ দিবসেও শেষ হল না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুষ্ট্যাঘাতে জাম্বুবান বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অবসন্ন ঘর্মাক্ত কলেবরে তিনি অবশেষে শ্রীভগবানকে চিনতে পেরে বললেন :

**জানে ত্বাং সর্বভূতানাং প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।**
**বিষ্ণুং পুরাণপুরুষং প্রভবিষ্ণুমধীশ্বরম্॥**

(১০।৫৬।২৬)

হে প্রভু ! আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। আপনি সকল প্রাণীর প্রভু, রক্ষক, পুরাণপুরুষ ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং। আপনি সর্বভূতের প্রাণ আর ইন্দ্রিয়-

বল, মনোবল ও দেহের সামর্থ্যস্বরূপ।

**ত্বং হি বিশ্বসৃজাং স্রষ্টা সৃজ্যানামপি যচ্চ সৎ।**
**কালং কলয়তামীশঃ পর আত্মা তথাঽঽত্মনাম্॥**

(১০।৫৬।২৭)

আপনি বিশ্বের নিমিত্তকারণ। সৃষ্ট বস্তুসমূহেও সত্তারূপে আপনিই বিরাজমান। কালের অবয়ব সমূহে তাদের নিয়ামক পরম কাল আপনিই এবং শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীয়মান অন্তরাত্মার পরম আত্মাও আপনিই।

জাম্বুবান তখন সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পুনরায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে আগমনের কথা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন। তখন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ নিজ পরম কল্যাণকর শীতল করকমল ঋক্ষরাজের দেহে স্থাপন করে অহৈতুকী কৃপাযুক্ত হয়ে প্রেমময় গম্ভীর স্বরে বললেন— হে ঋক্ষরাজ ! এই মণির জন্য আমি তোমার এই পর্বত কন্দরে এসেছি। এই মণির দ্বারা আমার উপর আরোপ করা মিথ্যা কলঙ্ক আমি মুছে ফেলতে চাই।

শ্রীভগবানের কথা শ্রবণ করে ঋক্ষরাজ জাম্বুবান পরম আনন্দে তাঁর পূজা করবার জন্য নিজ কন্যা জাম্ববতী স্যমন্তকমণি শ্রীভগবানের চরণে নিবেদন করে দিলেন। শ্রীভগবানের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করে ঋক্ষরাজ জাম্বুবান ধন্য হয়ে গেলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদের গিরি কন্দরের বাইরে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, তারা বারোদিন পর্যন্ত তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করেছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল যে তিনি গিরি কন্দর থেকে ফিরে এলেননা তখন তারা বিমর্ষ চিত্তে দ্বারকায় ফিরে গেল। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য মাতা দেবকী, রুক্মিণীদেবী, শ্রীবসুদেব ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দ্বারকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়তে সকলে সত্রাজিৎকে দোষ দিতে লাগল। তারা শ্রীকৃষ্ণের রক্ষা নিমিত্ত মহামায়া জগন্মাতা দুর্গাদেবীর শরণাগত হয়ে উপাসনা করতে লাগল। তখন মহামায়া জননী দুর্গা দেবী প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদ দিলেন। তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তকমণি ও নববধূ জাম্ববতীকে নিয়ে সফল মনোরথ হয়ে আবির্ভূত হলেন। দ্বারকার জনগণ দেখল যে তাদের পরম প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ফিরে এসেছেন সঙ্গে ভার্যা জাম্ববতী ও স্যমন্তকমণিও

রয়েছে। তারা পরমানন্দ অনুভূতি লাভ করল।

তদনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিৎকে মহারাজ উগ্রসেনের রাজসভায় ডেকে পাঠালেন আর মণি প্রাপ্তির সম্পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে স্যমন্তকমণি সত্রাজিৎকে অর্পণ করলেন। স্যমন্তকমণি সত্রাজিৎ ফিরে পেল কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপনের অপরাধে সে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হল।

অপরাধ বোধ যেন সত্রাজিৎকে সমানে তাড়া করতে লাগল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অমিত বিক্রম ; তাই সে ভীত হয়ে দিন কাটাতে লাগল। তখন তার একটাই চিন্তা—'অপরাধ স্খালন কেমন করে হবে ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেমন করে প্রসন্ন হবেন ?' সত্রাজিৎ এমন কোনও কার্য করতে চাইল যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন আর সে নিজে সকলের সম্মুখে মুখ তুলে তাকাতে পারে। লোভের বশীভূত হয়ে কৃত অপরাধ যে বিশাল !

**দাস্যে দুহিতরং তস্মৈ স্ত্রীরত্নং রত্নমেব চ।**
**উপায়োঽয়ং সমীচীনস্তস্য শান্তির্ন চান্যথা॥**

(১০।৫৬।৪২)

আমার কন্যারত্ন সত্যভামা আর স্যমন্তকমণি দুইই একসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করলে অপরাধ থেকে অব্যাহতি পাই।

এইরূপ স্থির করে সত্রাজিৎ তাই করল। সত্যভামা সুশীলা ও সদ্গুণ সম্পন্না ছিলেন। তাঁর রূপ ও উদারতা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথাবিধি তাঁর পাণিগ্রহণ করলেন ; আর স্যমন্তকমণি সত্রাজিৎকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—আপনি তো ভগবান সূর্যের ভক্ত তাই এটি আপনার কাছেই থাক। আমরা তার সুফলের ভাগ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাটরানিরূপে জাম্ববতীদেবী ও সত্যভামাদেবী দ্বারকার অন্তঃপুরে অধিষ্ঠিতা হলেন।

———o———

# কলঙ্কভঞ্জন বৃত্তান্ত

পাণ্ডবগণ যে জতুগৃহ থেকে সময় মতন বার হয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন তা অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবই জানতেন কিন্তু যখন তিনি দূত মারফৎ সংবাদ পেলেন যে কুন্তীদেবী পঞ্চপাণ্ডব সহ অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন তখন সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য তাঁকে অগ্রজ শ্রীবলরামকে নিয়ে হস্তিনাপুর যেতেই হল। সেইখানে গমন করে তাঁরা ভীষ্ম পিতামহ, কৃপাচার্য, বিদুর, গান্ধারী ও দ্রোণাচার্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন।

এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে দ্বারকায় একটা ঘটনা ঘটে গেল। কৃতবর্মা, অক্রূরকে সঙ্গী করে শতধন্বাকে সত্রাজিতের কাছ থেকে স্যমন্তকমণি কেড়ে নেওয়ার প্ররোচনা দিল। সত্যভামার বিবাহ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় তাদের মনে সত্রাজিতের উপর বিদ্বেষ ছিল। এইভাবে তার প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করল, কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত থাকলে তা যে আদৌ সম্ভব নয়, তা তারা ভালোই জানত। পাপাচারী ক্ষীণায়ু শতধন্বা সেই প্ররোচনায় চালিত হয়ে শায়িত সত্রাজিৎকে বধ করে স্যমন্তকমণি নিয়ে পলায়ন করল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণভার্যা সত্যভামাদেবী জানলেন যে তাঁর পিতা নিহত হয়েছেন। শোকাকুল কন্যা পিতার শবদেহকে তৈলদ্রোণিতে সংরক্ষণ করে স্বয়ং পতি সকাশে হস্তিনাপুর গেলেন। অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব কিছু জানলেও ভার্যার মুখে সত্রাজিৎ হত্যা বৃত্তান্ত শুনে স্বাভাবিক ভাবে অগ্রজ সহ সজল নয়নে বিলাপও করলেন। শ্রীভগবান তখন সকলকে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এলেন। শতধন্বাকে শিক্ষাদান ও স্যমন্তকমণি উদ্ধার কেমন করে করা হবে তার পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল। শতধন্বাকে বধ করাই স্থির হল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুইজনই দ্বারকায় নেই— তাই সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্যমন্তকমণি হরণ কার্য সম্পাদন হয়েছিল। এখন তাঁদের দ্বারকায় প্রত্যাগমনে শতধন্বা প্রমাদ গুণল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করতে সংকল্প করেছেন জেনে সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য

সে পরামর্শদাতা কৃতবর্মার সাহায্য প্রার্থনা করল আর উত্তর পেল—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরাম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বয়ং। তাঁদের বিরোধিতায় যাওয়া সম্ভব নয়। তুমি তো জান যে কংস তাঁদের বিরোধিতা করে সর্বস্ব হারিয়েছে। জরাসন্ধসম শৌর্যবীর্যসম্পন্ন মহারথী সতেরোবার তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রতিবার রথ ছাড়াই রাজধানী ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

শ্রীঅক্রূরকে প্রার্থনা করতে তিনি উত্তর দিলেন—ভাই! কে এমন আছে যে সর্বশক্তিমান ভগবানের বলবিক্রম জেনে তাঁর বিরোধিতায় নামবে। যিনি মাত্র সাত বৎসর বয়সে গিরি গোবর্ধন উৎপাটন করে সপ্ত দিবস ছত্র সম ধারণ করেছিলেন আমি সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে শত শতবার প্রণাম করি। এইরূপ উত্তর পেয়ে হতাশ হয়ে শতধন্বা স্যমন্তকমণি তাঁর কাছে রেখে গচ্ছিত রেখে শতযোজনগামী অশ্বে আরোহণ করে সে সেইখান থেকে পলায়ন করল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের গরুড়ধ্বজ রথে দ্রুতগতি অশ্ব সংযুক্ত করা ছিল। সত্রাজিৎহন্তা শতধন্বাকে তাঁরা অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন। মিথিলার উপবনে শতধন্বার অশ্ব পড়ে গেল ; তখন সে পদব্রজে পলায়ন করতে লাগল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সক্রোধে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রীভগবানের সুতীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্র শতধন্বার মস্তককে ছেদন করল। শ্রীভগবান তার বস্ত্রের মধ্যে স্যমন্তকমণি অনুসন্ধান করে পেলেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজকে বললেন— মনে হচ্ছে আমরা শতধন্বাকে বৃথাই বধ করলাম কারণ তার কাছে তো স্যমন্তকমণিই নেই। শ্রীবলরাম বললেন—মনে হচ্ছে শতধন্বা স্যমন্তকমণি অন্য কারো কাছে রেখেছে। তুমি দ্বারকায় গিয়ে তা খোঁজ করে দেখ। আমি ভাবছি একবার বিদেহরাজের সঙ্গে দেখা করব। তাই আমি মিথিলাতেই থেকে যাচ্ছি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একলাই দ্বারকায় ফিরে এলেন। সত্যভামাদেবী জানলেন যে পিতৃহন্তা শতধন্বার শাস্তি হয়েছে কিন্তু স্যমন্তকমণি তার কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্বশুর সত্রাজিতের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করালেন।

এইবার শতধন্বার পরামর্শদানকারীদের মনেও প্রবল ভীতি জন্মাল। তারা যখন শুনল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করেছেন তখন তারা

দ্বারকা ছেড়ে পলায়ন করল। তাই শ্রীঅক্রূর ও কৃতবর্মা দ্বারকা থেকে পলায়ন করলেন। দ্বারকার জনগণের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে শ্রীঅক্রূর থাকলে কোনো রকম কষ্ট ও মহামারী হয় না। তাদের শান্ত করবার জন্য শ্রীভগবান দূত পাঠিয়ে শ্রীঅক্রূরকে খুঁজে আনলেন।

শ্রীঅক্রূর ফিরে এলে আনন্দে অভ্যর্থনা করে শ্রীভগবান তাঁকে সুমধুর সম্ভাষণও করলেন। শ্রীভগবান তো সকলের চিত্তের সংকল্প জানেন। তিনি মৃদুহাস্য সহকারে বললেন—হে পিতৃব্য ! আপনি তো দান-ধর্ম পালন করে থাকেন। আমরা জানি যে শতধন্বা আপনার কাছে স্যমন্তকমণি গচ্ছিত রেখে গিয়েছে। তাতো জ্যোতির্ময় ও সম্পদপ্রদানকারী। সত্রাজিতের পুত্র না থাকাতে তাঁর দৌহিত্রই সেটির উত্তরাধিকারী হয়। এইভাবে রীতি অনুসারে স্যমন্তকমণি আমার পুত্রেরই পাওয়া উচিত। তবুও যেহেতু আপনি ব্রতনিষ্ঠ ও পবিত্রাত্মা আর অন্যদের পক্ষে স্যমন্তকমণি রাখা অতিশয় কঠিন, তাই আমি চাই যে স্যমন্তকমণি যেন আপনার কাছেই থাকে। স্যমন্তকমণির সম্বন্ধে আমার অগ্রজ শ্রীবলরাম আমার কথা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করেন না। তাই মহাভাগ্যবান শ্রীঅক্রূর ! আপনি সেই স্যমন্তকমণি আমার আত্মীয়স্বজন —শ্রীবলরাম, সত্যভামা ও জাম্ববতীকে একবার দেখিয়ে তাঁদের সন্দেহ দূর করুন ও তাঁদের চিত্তে শান্তি আনুন। শ্রীভগবানের কথায় সম্মত হয়ে তখন শ্রীঅক্রূর বস্ত্রে আবৃত সূর্যসম জ্যোতির্ময় স্যমন্তকমণি বার করলেন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন।

**স্যমন্তকং দর্শয়িত্বা জ্ঞাতিভ্যো রজ আত্মনঃ।**
**বিমৃজ্য মণিনা ভূয়স্তস্মৈ প্রত্যর্পয়ৎ প্রভুঃ॥** (১০।৫৭।৪১)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই স্যমন্তকমণি নিজ জ্ঞাতিভাইদের দেখিয়ে নিজের কলঙ্ক দূর করলেন এবং তা নিজে রাখতে সক্ষম হলেও সেটি শ্রীঅক্রূরকে ফিরিয়ে দিলেন।

এই উপাখ্যান আজও কলঙ্কভঞ্জন শক্তিসম্পন্ন উপাখ্যানরূপে ঘরে ঘরে পূজা পায়। অপকীর্তি ও পাপ থেকে মুক্তি লাভ করবার জন্য ও শান্তি লাভ করবার জন্য তা পাঠ করা হয়ে থাকে।

———০———

# পাটরানি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করলেন। তিনি সাত্যকি এবং বহু যদুবংশজাত বীরদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। সর্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদার্পণে পাণ্ডবদের মধ্যে যেন প্রাণ সঞ্চার হল। তাঁরা সকলে শ্রীভগবানকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে আসন দান করলেন। শ্রীযুধিষ্ঠির শ্রীভগবানের সম্মানে বললেন :

**কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীশ্বর।**

**যোগেশ্বরাণাং দুর্দর্শো যন্নো দৃষ্টঃ কুমেধসাম্॥** (১০।৫৮।১১)

হে সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ! আমরা জানি না যে পূর্বজন্মে বা এই জন্মে আমাদের কোনো সুকৃতি আছে ? আপনার দর্শন তো স্বনামধন্য যোগীগণও অতি কষ্টে লাভ করে থাকেন আর আমাদের মতন অধমদের গৃহে বসেই আপনার দর্শন লাভ করবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

একবার বীরশিরোমণি অর্জুন গাণ্ডীব ধনুক ও অক্ষয় তূণ নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিজ রথে উঠলেন যাতে বানর চিহ্নযুক্ত ধ্বজ লাগানো ছিল। দুইজনই বর্ম ধারণ করে মৃগয়ায় গেলেন। ভয়ংকর পশু পরিপূর্ণ অরণ্যে মৃগয়ায় অর্জুন তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ায় তৃষ্ণা নিবারণে তাঁরা যমুনা তীরে গমন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুইজনই মহারথী। তাঁরা যমুনায় হস্তপদ প্রক্ষালন করে তার নির্মল জল পান করলেন। হঠাৎ তাঁদের নজরে পড়ল যে একটি পরমাসুন্দরী কন্যা সেইখানে তপস্যা করছেন। সুন্দরীর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য অনুপম ছিল। প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অর্জুন সেই সুন্দরী রমণীর কাছে গমন করে প্রশ্ন করলেন :

**কা ত্বং কস্যাসি সুশ্রোণি কুতোঽসি কিং চিকীর্ষসি।**

**মন্যে ত্বাং পতিমিচ্ছন্তীং সর্বং কথয় শোভনে॥** (১০।৫৮।১৯)

হে সুন্দরী রমণী ! আপনি কে ? আপনার পিতৃপরিচয় কী ? কোথা থেকে এসেছেন ? কী করতে চান ? যোগ্য পতির খোঁজ করছেন কী ? হে কল্যাণী ! আমি সকল কথা শুনতে আগ্রহী।

সেইকন্যা বললেন—আমি ভগবান সূর্যের কন্যা কালিন্দী, আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা ভগবান বিষ্ণুকে পতিরূপে পাবার বাসনায় তপস্যা করবার চেষ্টা করছি। হে বীর অর্জুন ! আমি লক্ষ্মীর পরম আশ্রয় শ্রীভগবানকে ছেড়ে আর কাউকে নিজ পতিরূপে ভাবতেই পারি না। অনাথনাথ প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার উপর প্রসন্ন হন এই কামনা করি। যমুনাজলে আমার পিতা সূর্য আমার জন্য একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আমি তাইতেই বাস করি। শ্রীভগবানের দর্শন লাভ যতক্ষণ না হবে আমি এইখানেই থাকব।

অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবই জানতেন। তিনি কালিন্দীকে রথে বসিয়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন আর বেশ কিছু দিন পাণ্ডবদের সঙ্গে কাটিয়ে সকলের অনুমতি নিয়ে তিনি সাত্যকি এবং অন্যান্য মহারথীদের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরে এলেন। অতঃপর বিবাহের উপযুক্ত সময় ও জ্যোতিষশাস্ত্র অনুমোদিত পবিত্র লগ্নে তিনি কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করলেন।

অতঃপর অবন্তীররাজা বিন্দ ও অনুবিন্দের ভগিনী মিত্রবিন্দা স্বয়ংবর সভায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ পতিরূপে বরণ করতে চাইলেন। ভ্রাতাদের আপত্তিতে তা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শক্তিমান নৃপতিদের সম্মুখেই রাজসভা থেকে হরণ করে মিত্রবিন্দার পাণিগ্রহণ করে তাঁকে পাটরানির সম্মান দিলেন।

কৌশলদেশের রাজা ছিলেন নগ্নজিৎ। পরম ধার্মিক মহারাজার কন্যার নাম সত্যা হলেও পিতার নামানুসারে তিনি নাগ্নজিতী নামেও পরিচিতা ছিলেন। কন্যার বিবাহের জন্য পাত্রের শৌর্যবীর্যসম্পন্ন হওয়া রাজার মতে আবশ্যিক ছিল তাই তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁর সাত বৃষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে যে সক্ষম হবে তার সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দেবেন। বৃষ সকল সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গযুক্ত ছিল আর তারা বীর পুরুষদের আদৌ সহ্য করতে পারত না।

যদুবংশ শিরোমণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ জানলেন। তিনি বিশাল সৈন্য নিয়ে কৌশলপুরীতে (অযোধ্যায়) পৌঁছালেন। কৌশলাধিপতি মহারাজ নগ্নজিৎ অতি প্রসন্নতা সহকারে তাঁর অভ্যর্থনা করলেন আর আসনাদি পূজাপকরণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন।

**বরং বিলোক্যাভিমতং সমাগতং**
**নরেন্দ্রকন্যা চকমে রমাপতিম্।**
**ভূয়াদয়ং মে পতিরাশিষোঽমলাঃ**
**করোতু সত্যা যদি মে ধৃতো ব্রতৈঃ॥** (১০।৫৮।৩৬)

নগ্নজিৎ দুহিতা সত্যার চোখে পড়ল যে তাঁর চির অভিলষিত রমাপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন হয়েছে। তাঁর ব্রতাদি পালন কর্মাদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল— তাই তাঁকে লাভ করবার কামনা তাঁর মধ্যে জাগল।

সত্যা মনে মনে ভাবতে লাগলেন—ভগবতী লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শংকর ও বড় বড় লোকপাল যাঁর পদরজ পরাগ মস্তকে ধারণ করেন আর যিনি নিজ মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত যথোচিত কালে বহু লীলা দেহ ধারণ করেন সেই প্রভু কি আমার ধর্ম, ব্রত অথবা নিয়মে প্রসন্ন হবেন ? তিনি কেবল যদি কৃপা করে প্রসন্ন হন তবেই তা সম্ভব।

রাজা নগ্নজিৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিধিপূর্বক পূজা করে প্রশ্ন করলেন —আপনি জগৎপিতা নারায়ণ। আপনি স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ আর আমি এক তুচ্ছ মানব। আমি আপনার কী সেবা করব ?

তখন শ্রীভগবান স্মিতহাস্য সহকারে উত্তর দিলেন :

**নরেন্দ্র যাঞ্চা কবিভির্বিগর্হিতা রাজন্যবন্ধোর্নিজধর্মবর্তিনঃ।**
**তথাপি যাচে তব সৌহৃদেচ্ছয়া কন্যাং ত্বদীয়াং না হি শুল্কদা বয়ম্॥**
(১০।৫৮।৪০)

রাজা ! ক্ষত্রিয়ের যাচনা করা শোভা পায় না ; ধর্মজ্ঞ বিদ্বানগণ সেই কার্যের নিন্দা করে থাকেন । তবুও আমি আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করবার জন্য আপনার কন্যা যাচনা করছি। আমাদের পণ দানের প্রথা নেই।

যাঁর বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবী সতত বিরাজমান থাকেন এমন গুণধাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করবার এমন সুবর্ণ সুযোগ রাজা নগ্নজিৎকে বিহ্বল করে তুলল। কিন্তু তিনি যে প্রতিজ্ঞা করে বসে আছেন, তা রক্ষা করাও তো তাঁর কর্তব্য। বিবাহের পূর্বেই জামাতার শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন। তাই তো সপ্ত বৃষকে বশীভূত করবার প্রতিজ্ঞা করা। তা তিনি কেমন করে লঙ্ঘন করবেন ? তাই তিনি সবিনয়ে

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন :

**যদিমে নিগৃহিতাঃ স্যুত্ত্বয়ৈব যদুনন্দন।**
**বরো ভবানভিমতো দুহিতুর্মে শ্রিয়ঃ পতে॥** (১০।৫৮।৪৪)

হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে যদুনন্দন ! হে লক্ষ্মীপতি ! আমার (প্রতিজ্ঞা অনুসারে) যদি আপনি এই (দুর্দম্য) সপ্ত বৃষকে বশীভূত পারেন, তাহলেই আপনি আমার কন্যার অভীষ্ট বর হবেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা নগ্নজিতের এমন প্রতিজ্ঞার কথা শ্রবণ করে কটিদেশে নিজ উত্তরীয় কষে বেঁধে নিলেন। তিনি স্বয়ং সপ্তরূপে বিভক্ত হয়ে অনায়াসে সেই দুর্দম বৃষদের নাসিকায় রজ্জু স্থাপন করে দিলেন। তিনি অতঃপর সেই রজ্জু ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগলেন। অবাক বিস্ময়ে সকলে চাক্ষুষ দেখল যে সেই ভয়ংকর সপ্ত বৃষ মেষের ন্যায় এগিয়ে যাচ্ছে। রাজা নগ্নজিৎও হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রসন্নতা সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ কন্যা দান করে দিলেন আর সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণও সাগ্রহে সত্যার পাণিগ্রহণ করলেন। নগ্নজিৎ ভার্যাগণ অতি প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জামাতারূপে লাভ করে ধন্য হয়ে গেলেন। চতুর্দিকে উৎসব শুরু হয়ে গেল। শঙ্খ, ঢোল, কাড়ানাকাড়া বেজে উঠল। সমগ্র নগর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কৌশলনরেশ রাজা নগ্নজিৎ কন্যা ও জামাতাকে রথে চড়িয়ে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী সহিত বিদায় দিলেন।

পথে তাঁদের সেই সকল নৃপতিদের রোষের সম্মুখে পড়তে হল যাঁরা রাজকুমারী সত্যাকে বিবাহ করবার ইচ্ছায় এসে বৃষদের বশীভূত না করতে পেরে বিবাহযোগ্য বলে বিবেচিত হননি। তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যাকে ঘিরে ফেলে মুহুর্মুহু শরবর্ষণ করতে শুরু করল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণসখা অর্জুন গাণ্ডীব ধারণ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। অবশেষে দেবকীনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্যাকে নিয়ে নির্বিঘ্নে দ্বারকায় উপনীত হলেন।

ক্রমে ভদ্রা ও লক্ষ্ণণাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাটরানিরূপে দ্বারকায় স্থান পেলেন। দ্বারকা তখন অষ্টপানিতে সমৃদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুরম্য আবাসভূমিরূপে বৈকুণ্ঠের মর্যাদা লাভ করল। কারো কারো মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অষ্টপাটরানি বস্তুত অষ্টধা প্রকৃতি।

———০———

# মুর ও ভৌমাসুর বধ

দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারকায় এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবহিত করলেন যে ভৌমাসুর দেবতাদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করেছে। সে বরুণদেবের ছত্র, মাতা অদিতির কুণ্ডল আর মেরু পর্বতের উপর অবস্থিত মণিপর্বত হরণ করেছে। এর প্রতিবিধান আশু আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

দেবরাজকে আশ্বস্ত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পত্নী সত্যভামাকে নিয়ে গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণ করে ভৌমাসুরের রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রাগ্জ্যোতিষপুর গিরিদুর্গ ও শস্ত্রদুর্গ দ্বারা খুবই সুরক্ষিত ছিল। তার উপর গড়খাই, অগ্নি অথবা বিদ্যুতের প্রাচীর ও বায়ুশূন্য স্থানের বলয়ও ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গদা দ্বারা গিরিদুর্গ, চক্র দ্বারা অগ্নি, জল ও বায়ুর বেষ্টনী ধ্বংস করলেন। এ ছাড়া মুর দৈত্যের পাশও ছিল যা শ্রীভগবান সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা ছেদন করলেন। তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে ভীতি জাগল ও গদা দ্বারা প্রাচীর ধ্বংস হল।

সেই প্রলয়কালীন বজ্রসম ভয়ংকর পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে মুর দৈত্যেরও নিদ্রাভঙ্গ হল। দৈত্য প্রলয়কালীন সূর্য ও অগ্নি সম প্রচণ্ড তেজস্বী ছিল। সে গরুড় বাহনের দিকে ত্রিশূল নিক্ষেপ করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শরাঘাতে তা খণ্ডিত করলেন। এইবার মুর দৈত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর গদা প্রহার করাতে তার দিকেও শ্রীভগবান গদা নিক্ষেপ করলেন। মুরের গদা চূর্ণবিচূর্ণ হল। অস্ত্রহীন মুর দৈত্য তখন শ্রীভগবানের দিকে তেড়ে এল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র মুর দৈত্যের পঞ্চমুণ্ড দেহ থেকে বিচ্যুত করে ভূলুণ্ঠিত করল। মুর বধ করে শ্রীভগবান 'মুরারি' নামেও পরিচিত হলেন। এই মুর দৈত্যর সপ্ত পুত্র তাম্র, অন্তরিক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান্ ও অরুণ — পিতৃহন্তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ধেয়ে এল। ভৌমাসুরের পুত্রদের আদেশে পীঠ দৈত্যও সেনাপতিরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে এল। সকলেই পর্যুদস্ত হল।

এইবার ভূমিপুত্র নরকাসুর (ভৌমাসুর) মদশ্রাবী সমুদ্রজাত হস্তীসমূহ সৈন্য নিয়ে শ্রীভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নগরের বাইরে বেরিয়ে এল। সে দেখল যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীর সঙ্গে আকাশে গরুড় পৃষ্ঠে অবস্থান করছেন। তার মনে হল যে সূর্যের উপর বর্ষার শ্যামল মেঘমালা শোভমান রয়েছে। ভৌমাসুর শ্রীভগবানের উপর শতঘ্নী শক্তিশেল প্রয়োগ করল। গদাগ্রজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখনই বিচিত্র পক্ষ বিশিষ্ট সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করে শতঘ্নী অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করলেন। ভৌমাসুর নিক্ষিপ্ত সকল অস্ত্রই শ্রীভগবান শক্তিহীন করে দিলেন।

অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বধ করবার জন্য ভৌমাসুর এক ত্রিশূল তুলে নিল। ত্রিশূল নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুতীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা হস্তীর উপর আসীন ভৌমাসুরের মস্তক ছেদন হল। দেদীপ্যমান কুণ্ডল ও সুন্দর কিরীট সহ ভৌমাসুরের মস্তক ভূলুণ্ঠিত হল। ঋষিগণ সাধুবাদ দিলেন ও দেবতাগণ শ্রীভগবানের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

এইবার মূর্তিমতী পৃথিবীদেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁর কণ্ঠে বৈজয়ন্তী ও বনমালা পরিয়ে দিলেন ও ভৌমাসুরের অপহরণ করা বরুণদেবের ছত্র ও অদিতি মাতার রত্নমণ্ডিত সুবর্ণময় কুণ্ডল ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর বিশ্বেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করে হাত জোড় করে পৃথিবীদেবী বললেন :

**নমস্তে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর।**
**ভক্তেচ্ছোপাত্তরূপায় পরমাত্মন্ নমোঽস্তু তে॥**

(১০।৫৯।২৫)

হে শঙ্খচক্রগদাধারী দেবাদিদেব ! আমি আপনাকে নমস্কার করি। হে পরমাত্মা ! আপনি নিজ ভক্তগণের প্রীতির জন্য তাদের ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করে থাকেন। আপনাকে সদা প্রণাম।

**নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।**
**নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥**

(১০।৫৯।২৬)

পদ্মনাভ আপনাকে প্রণাম, পদ্মমাল্যভূষিত আপনাকে প্রণাম।

কমললোচন আপনাকে প্রণাম। কমলাঙ্ঘ্রিতে আমার প্রণাম নিবেদন করছি।

**নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বিষ্ণবে।**
**পুরুষায়াদিবীজায় পূর্ণবোধায় তে নমঃ॥**

(১০।৫৯।২৭)

আপনি ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশ,সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আশ্রয়। অপানি সর্বব্যাপী হয়েও বসুদেবনন্দনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনিই পরমপুরুষ, সকল কারণের পরম কারণ। আপনি পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ। আপনাকে প্রণাম।

এইভাবে স্তুতি করে পৃথিবীদেবী বললেন—হে শরণাগত বৎসল প্রভু ! আমার পুত্র ভৌমাসুরের পুত্র ভগদত্ত অতিশয় ভীত হয়ে পড়েছে। আপনি একে আপনার চরণকমলে স্থান দিন। একে রক্ষা করুন।

ভগদত্তকে অভয়দান করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু সম্পদসম্পন্ন ভৌমাসুরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন যে ভৌমাসুর কর্তৃক অপহৃতা ষোড়শ সহস্র ক্ষত্রিয় রাজকন্যাকে মহলে বন্দি করে রাখা আছে ? ভৌমাসুর সেই কন্যাদের ক্ষত্রিয় নৃপতিদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেছিল। অন্তঃপুরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেছেন দেখে রাজকন্যাগণ তাঁকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর অহৈতুকী কৃপা ও নিজ সৌভাগ্য মনে করে তাঁরা মনে মনে শ্রীভগবানকে পতিরূপে বরণ করে নিলেন। প্রত্যেকের মনেই সেই এক ইচ্ছাই হয়েছিল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই রাজকন্যাদের উত্তম বস্ত্রালংকারে ভূষিত করে দিলেন আর তাঁদের শিবিকায় করে দ্বারকায় প্রেরণ করলেন। এর সঙ্গে বহু ধনসম্পদ, রথ, অশ্ব ও চারদন্ত বিশিষ্ট শ্বেত হস্তীও যৌতুকরূপে প্রেরিত হয়েছিল।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভৌমাসুর কর্তৃক অপহরণ করা দ্রব্যাদি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অমরাবতীতে গমন করলেন। তাঁর সঙ্গে ভার্যা সত্যভামা তো ছিলেনই। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের যোগ্য অভ্যর্থনা ও পূজার্চনা করলেন। অতঃপর ভৌমাসুর কর্তৃক অপহরণ করা বরুণদেবতার ছত্র, দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল ও দেববিহারস্থল মণিপর্বতও দেবরাজাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ফিরিয়ে দিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র প্রণাম করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

এইবার ভার্যা সত্যভামার ইচ্ছানুসার শ্রীভগবান পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটন করে বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখতেই দেবরাজ ইন্দ্র পারিজাত বৃক্ষ উৎপাটনের জন্য সেই শ্রীভগবানেরই বিরোধিতা করলেন। শ্রীভগবান তখন দেবরাজকে পরাজিত করে পারিজাত বৃক্ষ দ্বারকায় নিয়ে এসে ভার্যা সত্যভামার মহলের উদ্যানে প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। পারিজাতের পুষ্প গন্ধ ও মকরন্দ লোভী ভ্রমরগণও স্বর্গ থেকে দ্বারকায় এসে গেল। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভৌমাসুরের অন্তঃপুর থেকে উদ্ধার করা রাজকন্যাদের মনোবাসনা পূরণে উদ্‌যোগী হলেন। ওদিকে দেবলোকে অসদাচরণের জন্য দেবরাজ নিন্দিত হলেন।

**অথো মুহূর্ত একস্মিন্ নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ।**
**যথোপযেমে ভগবাংস্তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ॥**

(১০।৫৯।৪২)

তারপর রাজকন্যাদের সমসংখ্যক রূপ ধারণ করে একই শুভলগ্নে ভিন্ন ভিন্ন মহলে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বিবাহ করলেন।

এইভাবে শ্রীভগবানের এই অতিশয় আশ্চর্যজনক লীলা বিন্যাস হল। ভার্যাদের মহল সকল দিব্য বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ ছিল। ভার্যাগণ সকলেই লক্ষ্মীদেবীর অংশ সম্ভূতা ছিলেন আর সকলেই অবিনশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হতেন। তাঁর আচরণ ভার্যাদের সঙ্গে তেমনই ছিল যেমন একজন সাধারণ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে বাস করে গৃহস্থধর্ম অনুসারে আচরণ করে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণও শ্রীভগবানের বাস্তব স্বরূপকে আর তাঁকে লাভ করবার পথ জানতেন না। সেই রমারমণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেই রমণীগণ পতিরূপে লাভ করেছিলেন। শত শত দাসী থাকা সত্ত্বেও যখনই শ্রীভগবান তাঁদের মহলে পদার্পণ করতেন তখন নিজে তাঁরা এগিয়ে এসে পরম সমাদরে তাঁকে আসন দিতেন, উত্তম সামগ্রী দ্বারা পূজা করতেন, পাদ-প্রক্ষালন করে দিলেন, তাম্বূল দান করতেন, পদসেবা করতেন, ব্যজন করতেন, চন্দন লেপন করতেন, পুষ্পমাল্য দান করতেন, স্নান-আহারাদি করিয়ে দিতেন। শ্রীভগবানের সেবা তাঁরা নিজের হাতেই করতেন।

শ্রীভগবানের অনন্য নরলীলা বহু সময় মানববুদ্ধিতে বোঝা কঠিন হয়ে

পড়ে। তিনি যে বোধগম্য ; তাই যদি তিনি বুঝিয়ে দেন তবেই সাধারণ মানব আমরা তা বুঝতে পারি। সর্বজীবের অন্তরে অধিষ্ঠান করে আত্মারূপে সেই অনন্ত পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পরমাত্মা সকলের সঙ্গে বিরাজমান থাকেন। যে যেভাবে তাঁর সঙ্গে রমণ করতে ইচ্ছা করে পরমাত্মা তার সঙ্গে তেমন ভাবেই মিলিত হন। সেই ভৌমাসুরের অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাজকন্যাগণ শ্রীভগবানকে পতিরূপে পেতে ইচ্ছা করেছিলেন। তাঁদের অনুরাগে রঞ্জিত মনকে তুষ্ট করবার জন্যই শ্রীভগবানের বহুরূপে বিভক্ত হয়ে একই লগ্নে ভিন্ন ভিন্ন মহলে তাঁদের ভার্যারূপে স্বীকৃতি দান কার্য হয়েছিল। যিনি জগৎপতি তিনি তো এমনিতেই সেই রমণীগণের পতি। তাঁদের ইচ্ছা ছিল মধুর রসে মিলন। তাই শ্রীভগবান তাঁদের তাই দিয়েছেন। গোচারণ কালে যে বালকগণ তাঁর সখ্য কামনা করেছিল তাঁদেরও তো তিনি সখ্য দান করে তুষ্ট করেছিলেন। তাই ভক্ত যেমনভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গে মিলন কামনা করে, তিনি তাকে তাই দেন। কথিত আছে যে এই ষোড়শ সহস্র ভার্যাগণ হলেন শ্রুতির উপাসনাকাণ্ডের ষোড়শ মন্ত্র।

---
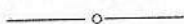
# রাজসূয় যজ্ঞ প্রস্তুতি ও জরাসন্ধ উদ্ধার

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রাজ্য স্থাপন করে তাঁর মাতামহ শ্রীউগ্রসেনকে রাজা করেছিলেন কিন্তু রাজ্য পরিচালনায় তিনি নিজেও যুবরাজরূপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। একদিন তিনি যদুবংশের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সুধর্মা সভাতে বসেছিলেন। সেই সুধর্মা সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের বিশেষত্ব ছিল যে তাঁরা কখনও ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শোক-মোহ, জরা-মৃত্যু দ্বারা সন্তপ্ত হতেন না। তখন মৃদঙ্গ, বীণা, পাখোয়াজ, বাঁশি, ঝাঁঝ ও শঙ্খ ধ্বনিতে আকাশবাতাস পূর্ণ হয়েছিল আর সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন। এমন সময়ে দ্বারকাপুরীর দ্বারে এক দূতের আগমন হল। দ্বাররক্ষকের মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানলেন যে দূত তাঁর দর্শন প্রার্থী। দূতকে রাজসভায় উপস্থিত করতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিলেন। সেই দূত রাজসভায় এসে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করল আর বলল—জরাসন্ধের দিগ্বিজয় করবার সময়ে সে যে নৃপতিদের গিরিদুর্গে বন্দি করে রেখেছে সেই বিংশ সহস্র নৃপতিগণ আপনার সম্মুখে নিজ দুঃখের কথা নিবেদন করে বার্তা প্রেরণ করেছেন :

**কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ প্রপন্নভয়ভঞ্জন।**
**বয়ং ত্বাং শরণং যামো ভবভীতাঃ পৃথগ্ধিয়ঃ॥** (১০।৭০।২৫)

সচ্চিদানন্দস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি বাক্য-মনাতীত। শরণাগতর সকল ভয় আপনি নষ্ট করে দেন। আমাদের ভেদবুদ্ধি নষ্ট হয়নি। আমরা জন্মমৃত্যুরূপ গতায়াত ভয়ে ভীত হয়ে আপনার শরণাগত হয়েছি।

আপনি জগদীশ্বর। সাধুদিগের রক্ষা ও দুষ্টের দমন হেতু আপনার আগমন হয়েছে। তাই হে প্রভু ! জরাসন্ধ আদি অন্য কোনো নৃপতি আপনার ইচ্ছা ও আদেশ ছাড়া কেমন করে আমাদের কষ্ট দেয়। যদি বলেন যে আমাদের দুষ্কর্মই আমাদের দুঃখ দিচ্ছে, তবু আমরা মনে করি তাও আমাদের ফল কেমন করে দিতে পারে ? তাই আপনি কৃপা করে আমাদের এই ক্লেশ

থেকে মুক্তি দিন। হে চক্রপাণি ! আপনি আঠারো বার জরাসন্ধর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন আর সতেরো বার তার সম্মান হরণ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছেন। একবার, সে যুদ্ধে আপনাকে পরাস্ত করেছে। আমরা জানি যে আপনি অমিত বিক্রম, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। আপনি অবশ্যই পরাজিত হওয়ার অভিনয় করেছেন। তাই জরাসন্ধের অহংকার বেড়ে গিয়েছে। হে অজিত ! যেহেতু আমরা আপনার ভক্ত ও প্রজা, তাই সে আমাদের উপর বেশি করে অত্যাচার করে। এবার আপনার যেমন অভিরুচি তেমনই করবেন।

বন্দি নৃপতিদের বার্তা প্রদান করে দূত বলল—নৃপতিগণ আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত। তাঁরা আপনার দর্শন কামনা করেন। আপনি সেই নৃপতিদের কল্যাণ করুন।

তখনই রাজসভায় দেবর্ষি নারদের আগমন হল। সপার্ষদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ দেবর্ষি নারদকে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করলেন। অতঃপর তিনি দেবর্ষি নারদকে আসন দান করে বিধিপূর্বক পূজা করলেন। যখন শ্রীভগবান দেবর্ষি নারদের কাছে জানতে চাইলেন যে যুধিষ্ঠির আদি পাণ্ডবগণ কেমন আছেন তখন তিনি উত্তর দিলেন :

**অথাপ্যাশ্রাবয়ে ব্রহ্ম নরলোকবিড়ম্বনম্।**
**রাজ্ঞঃ পৈতৃষ্বসেয়স্য ভক্তস্য চ চিকীর্ষিতম্॥** (১০।৭০।৪০)

হে প্রভু ! আপনি পরব্রহ্ম স্বয়ং তবু মানবদেহ ধারণ করে এই সকল কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন। তাই আপনার পিসতুতো ভ্রাতা ও প্রেমীভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির কী করতে চান সেই কথা আপনাকে বলছি।

**যক্ষ্যতি ত্বাং মখেন্দ্রেণ রাজসূয়েন পাণ্ডবঃ।**
**পারমেষ্ঠ্যকামো নৃপতিস্তদ্ ভবাননুমোদতাম্॥** (১০।৭০।৪১)

রাজা যুধিষ্ঠির যে ব্রহ্মলোকের ভোগ এই ধরাধামেই উপভোগ করে থাকেন তাতে একটুও সন্দেহ নেই। তবুও তিনি পবিত্র রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করে আপনার প্রাপ্তির নিমিত্ত আরাধনা করতে আগ্রহী। তাঁর অভিলাষ আপনি অনুমোদন করলে তিনি ধন্য হবেন।

**তস্মিন্ দেব ক্রতুবরে ভবন্তং বৈ সুরাদয়ঃ।**
**দিদৃক্ষবঃ সমেষ্যন্তি রাজানশ্চ যশস্বিনঃ॥** (১০।৭০।৪২)

ভগবন্ ! সেই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে আপনাকে দর্শন করবার জন্য বহু বড় বড় দেবতা ও নৃপতি সকল সমবেত হবেন।

আপনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। আপনার দর্শন লাভ করে পতিতও উদ্ধার হয়ে যায়। তাই রাজসূয় যজ্ঞে সমবেত ব্যক্তিগণ যে আপনার দর্শন ও স্পর্শ লাভ করে ধন্য হয়ে যাবে তা তো সুনিশ্চিত। হে ত্রিভুবনের মঙ্গলকারী ! আপনার নির্মল কীর্তি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল সর্বত্র ছেয়ে আছে, ঠিক তেমন ভাবেই যেমন ভাবে আপনার চরণামৃতধারা স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভোগবতী ও মর্ত্যলোকে গঙ্গা নামে প্রবাহিতা হয়ে সমগ্র বিশ্বকে পবিত্রতা প্রদান করছে।

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ চাইছিলেন যে প্রথমে জরাসন্ধকে শিক্ষাদান করাই শ্রেয় তাই তাঁদের দেবর্ষি নারদের কথা পছন্দ হল না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রী উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ভেবে-চিন্তে কী করা উচিত, তা বলা হোক।

শ্রীউদ্ধব অতঃপর শ্রীভগবানকে বললেন—জরাসন্ধ বেঁচে থাকলে তো রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করা কঠিন, কারণ তার মধ্যে তো দশ সহস্র হস্তীর বল বর্তমান। জরাসন্ধকে পরাজিত করতে পারেন কেবল ভীমসেন কারণ তিনিও সমরূপ অমিত বিক্রম। জরাসন্ধের সঙ্গে সম্মুখ সমরে না নেমে ভীমসেন যদি তাকে পরাজিত করেন তাহলেই ভালো হয়। জরাসন্ধ তো একান্তভাবে ব্রাহ্মণ-ভক্ত ; ব্রাহ্মণ চাইলে সে সব কিছু দিতে প্রস্তুত। তাই ভীমসেন ব্রাহ্মণ বেশে তার কাছে গিয়ে যুদ্ধ ভিক্ষা করলে ভালো হয়। ভীমসেন ও জরাসন্ধের দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিশ্চিতভাবে ভীমসেনই জিতবেন।

**নিমিত্তং পরমীশস্য বিশ্বসর্গনিরোধয়োঃ।**
**হিরণ্যগর্ভঃ শর্বশ্চ কালস্যারূপিণস্তব॥** (১০।৭১।৮)

হে প্রভু ! আপনি সর্বশক্তিমান, রূপরহিত কালস্বরূপ। বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় আপনারই শক্তিতে হয়ে থাকে, ব্রহ্মা ও শংকর তো তাতে নিমিত্ত মাত্র। (এইভাবেই জরাসন্ধ বধ হবে আপনার শক্তিতে, ভীমসেন কেবল নিমিত্ত মাত্র হবেন)।

শ্রীউদ্ধবের পরামর্শ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পছন্দ হল। দেবর্ষি নারদ ও

যদুবংশের বয়োজ্যেষ্ঠগণও তা সমর্থন করলেন। অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব আদি গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে দারুক, জৈত্র আদি সেবকদের ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদুরাজ শ্রীউগ্রসেন ও শ্রীবলরামের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ভার্যা ও সন্তানদের যাত্রা করিয়ে দিয়ে দারুকের আনা গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করলেন।

রথে আরোহণের পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে নানাভাবে পূজার্চনা করলেন। দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানকে মনে মনে প্রণাম করে আকাশ পথে চলে গেলেন।

**রাজদূতমুবাচেদং ভগবান্ প্রীণয়ন্ গিরা।**
**মা ভৈষ্ট দূত ভদ্রং বো ঘাতয়িষ্যামি মাগধম্॥ (১০।৭১।১৯)**

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের বন্দি নৃপতিদের দূতকে নিজ সুমধুর কথায় আশ্বস্ত করে বললেন—দূত ! তুমি নৃপতিদের বোলো—ভয় নেই। সকলের কল্যাণ হবে। আমি জরাসন্ধকে বধ করার ব্যবস্থা করে দেবো। শ্রীভগবান এইবার যাত্রা করলেন।

অজাতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠির জানতে পারলেন যে দুর্লভ দর্শন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভাগমন হয়েছে। আনন্দে অঙ্গে তিনি রোমাঞ্চ অনুভূতি লাভ করলেন। তিনি আচার্য ও আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে শ্রীভগবানকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য এগিয়ে গেলেন।

**গীতবাদিত্রঘোষেণ ব্রহ্মঘোষেণ ভূয়সা।**
**অভ্যয়াৎ স হৃষীকেশং প্রাণাঃ প্রাণমিবাদৃতঃ॥ (১০।৭১।২৪)**

মঙ্গলোৎসবে গীতি বাদ্য পরিবেশন হতে লাগল। ব্রাহ্মণগণ একযোগে উচ্চনাদে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। তিনি প্রীতিতে গদগদ হয়ে ভগবান হৃষীকেশকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেলেন ; তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন ইন্দ্রিয়সকল মুখ্য প্রাণের সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে।

**দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য রমামলালয়ং মুকুন্দগাত্রং নৃপতির্হতাশুভঃ।**
**লেভে পরাং নির্বৃতিমশ্রুলোচনো হৃষ্যত্তনুর্বিস্মৃতলোকবিভ্রমঃ॥**
**(১০।৭১।২৬)**

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ ভগবতী দেবীলক্ষ্মীর পবিত্র ও একমাত্র নিবাসস্থান। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁকে দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে সকল পাপ তাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলেন। তিনি লোক ব্যবহার ভুলে গেলেন আর আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। অঙ্গে তাঁর রোমাঞ্চ পুলক অনুভূতি ছিল। বিশ্ব প্রপঞ্চের ভ্রমের তাঁর একটুও স্মরণ রইল না।

অতঃপর ভীমসেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই তাঁদের মামাতো ভাই শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন।

**পৃথা বিলোক্য ভ্রাত্রেয়ং কৃষ্ণং ত্রিভুবনেশ্বরম্।**
**প্রীতাত্মোৎথায় পর্যংঙ্কাৎ সস্নুষা পরিষস্বজে॥** (১০।৭১।৩৯)

যখন কুন্তীদেবী নিজ ত্রিভুবনেশ্বর ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন তখন তাঁর অন্তর প্রীতিতে পরিপূর্ণ হল। তিনি পুত্রবধূদের সঙ্গে নিয়ে পালঙ্ক থেকে নেমে এলেন আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

**গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ।**
**পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ॥** (১০।৭১।৪০)

দেবাদিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাজপ্রাসাদের ভিতর এনে সমাদর ও আনন্দ আতিশয্যে রাজা যুধিষ্ঠির আত্মবিস্মৃত হয়ে গেলেন। তিনি কীভাবে শ্রীভগবানের পূজা করতে হয় তাই ভুলে গেলেন।

**শ্বশ্বা সঞ্চোদিতা কৃষ্ণা কৃষ্ণপত্নীশ্চ সর্বশঃ।**
**আনর্চ রুক্মিণীং সত্যাং ভদ্রাং জাম্ববতীং তথা।**
**কালিন্দীং মিত্রবিন্দাং চ শৈব্যাং নাগজিতীং সতীম্।**
**অন্যাশ্চাভ্যাগতা যাস্তু বাসঃস্রঙ্মণ্ডনাদিভিঃ॥**

(১০।৭১।৪২-৪৩)

শ্বশ্রূমাতা কুন্তীদেবীর আদেশে দ্রৌপদী বস্ত্র, আভরণ ও পুষ্পমাল্য দ্বারা রুক্মিণীদেবী, সত্যভামাদেবী, ভদ্রাদেবী, জাম্ববতীদেবী, কালিন্দীদেবী, মিত্রবিন্দাদেবী, লক্ষ্মণাদেবী ও নাগ্নজিতীদেবীকে অন্যান্য রানিদের সঙ্গে অর্চনা করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আনন্দ দান করবার জন্য কয়েকমাস ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করলেন।

একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসভায় মুনি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ভ্রাতাগণ, আচার্য, কুলবয়োবৃদ্ধগণ ও আত্মীয়স্বজন পরিবৃত হয়ে বসে ছিলেন। তিনি সকলের সম্মুখেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন :

**ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজসূয়েন পাবনীঃ।**
**যক্ষ্যে বিভূতীর্ভবতস্তৎ সম্পাদয় নঃ প্রভো॥** (১০।৭২।৩)

হে প্রভু ! হে গোবিন্দ ! আমি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞ দ্বারা আপনার ও আপার পরম পবিত্র বিভূতিস্বরূপ দেবতাদের অর্চনা করতে চাই। কৃপা করে আমার সংকল্প পূর্ণ করুন।

হে কঞ্জনাভ ! আপনার শ্রীপাদপদ্মের পাদুকাই সকল অমঙ্গল বিনাশ করতে সক্ষম হয়। যাঁরা তা সতত সেবা করেন, ধ্যান ও স্তুতি করেন, বস্তুত তাঁরাই পবিত্রাত্মা। হে দেবাদিদেব ! আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবার প্রভাব জগৎকে দেখাতে চাই। হে প্রভু ! আপনি সকলের আত্মা, সমদর্শী ও আত্মানন্দ স্বয়ং পরব্রহ্ম। তা প্রতিষ্ঠা করতেই আমার এই রাজসূয় যজ্ঞ সংকল্প।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—মহারাজ ! পৃথিবীর সমস্ত নৃপতিদের পরাভূত করে ও তাদের বশীভূত করে যজ্ঞোচিত সম্পূর্ণ সামগ্রী একত্রিত করে তারপর এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। মহারাজ ! আপনার অনুজ চতুষ্টয় বায়ু, ইন্দ্র আদি লোকপালদের অংশে জাত। তারা সকলেই মহাবীর। আপনি তো পরম মনস্বী ও সংযমী। যারা নিজ ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করতে সক্ষম নয় আমি তাদের বশীভূত হই না। অতএব দেববলে শক্তিধর ভ্রাতাদের দিগ্বিজয়ের কার্যে নিযুক্ত করুন।

দিগ্বিজয়ে বার হয়ে সকলেই সফল হলেন কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির জানলেন যে জরাসন্ধকে পরাভূত করা যাচ্ছে না। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজা শ্রীউদ্ধবের পরামর্শের কথা বললেন। সেইভাবে কার্যসিদ্ধি করবার জন্য ভীমসেন, অর্জুন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—এই তিনজন ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে গিরিব্রজে গমন করলেন। গিরিব্রজ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণগণ অতিথিরূপে সমাদর লাভ করলেন।

**রাজন্ বিদ্ধ্যতিথীন্ প্রাপ্তানর্থিনো দূরমাগতান্।**
**তন্নঃ প্রযচ্ছ ভদ্রং তে যদ্ বয়ং কাময়ামহে॥** (১০।৭২।১৮)

রাজা ! আপনার কল্যাণ হোক। আমরা তিনজন আপনার অতিথি ও বহু দূর থেকে এসেছি। অবশ্যই আমরা এইখানে বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। তাই আমরা আপনার কাছে যা চাই তা আপনি আমাদের অবশ্যই প্রদান করুন।

তিতিক্ষু ব্যক্তি সব কিছু সহ্য করে। দুষ্ট ব্যক্তির কুকর্মের সীমা থাকে না। উদার ব্যক্তি সব কিছুই দান করতে পারেন আর সমদর্শীর আপন-পর থাকে না। আপনি দানবীর তাই আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুণ। হতাশ করবেন না।

জরাসন্ধ তাঁদের কণ্ঠস্বর, পেশীবহুল দেহ ও কব্জিতে জ্যা-আঘাতজনিত চিহ্ন থেকে বুঝতে পেরেছিল যে অতিথিত্রয় ব্রাহ্মণ আদৌ নয়, তারা ক্ষত্রিয়। সে মনে করতে পারল না যে তাদের কোথায় পূর্বে দেখেছে। সে বিচার করে স্থির করে ফেলল যে যেহেতু তার ভয়ে ব্রাহ্মণ সেজে এসেছে তাই তাঁরা যা যাচনা করছে, তা দিয়ে দেওয়াই ভালো।

জরাসন্ধের মনে উদার ভাব ছিল। সে ভেবে বলল— হে ব্রাহ্মণগণ ! আপনাদের অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করুন। আপনারা আমার প্রাণ চাইলেও আমি দিতে প্রস্তুত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন—

**যুদ্ধং নো দেহি রাজেন্দ্র দ্বন্দ্বশো যদি মন্যসে।**
**যুদ্ধার্থিনো বয়ং প্রাপ্তা রাজন্যা নান্নকাঙ্ক্ষিণঃ॥** (১০।৭২।২৮)

হে রাজেন্দ্র ! আমরা অন্নভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আদৌ নই। আমরা ক্ষত্রিয়। আপনার দান করবার ইচ্ছা থাকলে আপনি আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধ ভিক্ষা দিন।

অতঃপর শ্রীভগবান নিজেদের প্রকৃত পরিচয় দান করলে জরাসন্ধ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল আর সক্রোধে বলল—ওরে মহামূঢ়গণ ! যদি তোদের যুদ্ধ করবার বাসনা থাকে তবে আমি তাই দেবো। জরাসন্ধ তাচ্ছিল্য সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে তার সমকক্ষ বীর বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করে ভীমসেনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল। দম্ভ তার সহজাত কারণ কংস ভার্যা 'অস্তি ও প্রাপ্তির' সে পিতা।

জরাসন্ধ ভীমসেনকে এক বিশাল গদা দিল আর স্বয়ং অন্য একটি গদা

নিয়ে নগরের বাইরে বেরিয়ে এল। এইবার উভয়ের তুমুল গদাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। গদা প্রতিপক্ষ বীরের অঙ্গ স্পর্শ করেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর মুষ্টি যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ হতে লাগল। সমকক্ষ বীর হওয়ায় সপ্তবিংশতি দিবসেও মীমাংসা হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। অষ্টবিংশতি দিবসে ভীমসেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন—যুদ্ধে জরাসন্ধকে পরাজিত করা কঠিন বলে মনে হচ্ছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের জন্ম রহস্য জানতেন। তিনি ভীমসেনের মধ্যে নিজ শক্তি সঞ্চার করে জরাসন্ধ বধের উপায় বলে দিলেন :

**সঞ্চিন্ত্যারিবধোপায়ং ভীমস্যামোঘদর্শনঃ।**
**দর্শয়ামাস বিটপং পাটয়ন্নিব সংজ্ঞয়া॥** (১০।৭২।৪৩)

অসীম জ্ঞানভাণ্ডার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের উপায় একটি বৃক্ষের ডালকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দেখিয়ে দিলেন।

শ্রীভগবানের সংকেত বুঝতে পেরে মহাবীর ভীমসেন জরাসন্ধের পদদ্বয় হাত দিয়ে ধরে তাকে ভূমিতে ফেলে দিলেন। অতঃপর গজরাজ যেমনভাবে বৃক্ষশাখা বিদারণ করে তেমনইভাবেই তাকে একটি পদ নিজ পদ দিয়ে চেপে রেখে অন্য পদকে দুই হাতে ধরে নীচ দিক থেকে শুরু করে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দূত দ্বারা জরাসন্ধের হাতে বন্দি নৃপতিদের দেওয়া কথা রাখলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভীমসেনকে প্রণাম করে আলিঙ্গন দান করলেন। বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান প্রদর্শনও বাদ গেল না।

জরাসন্ধ বধের পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুইটি কার্য সম্পাদন করলেন। প্রথম কার্য জরাসন্ধের রাজসিংহাসনে তার পুত্র সহদেবকে অভিষিক্ত করা। দ্বিতীয় অবরুদ্ধ নৃপতিদের কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান করা।

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর নৃপতিগণ কৃশকায়, শুষ্কবদন ও শিথিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে পড়েছিল। গিরিকন্দর থেকে নির্গত হয়েই তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করল। নবনীরদকান্ত শ্যামসুন্দর তখন কৌষেয় বস্ত্র ধারণ করে ছিলেন।

**শ্রীবৎসাঙ্কং চতুর্বাহুং পদ্মগর্ভারুণেক্ষণম্।**
**চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥** (১০।৭৩।৩)

শ্রীভগবান তাদের শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজরূপে দর্শন

দিয়েছিলেন। অরুণাভাযুক্ত নয়নযুগল পদ্মগর্ভসম কোমল ছিল। প্রসন্ন বদন শ্রীভগবান কর্ণযুগলে জ্যোতির্ময় মকরাকৃতি কুণ্ডল ধারণ ও কিরীট, মুক্তাহার, বলয়, চন্দ্রহার ও বাজুবন্ধ পরিশোভিত ছিলেন।

নৃপতিদের সম্মুখে তখন জ্যোতির্ময় কৌস্তুভমণি ও লম্বিত বনমালায় সজ্জিত শ্রীভগবান স্বয়ং। তাদের ইন্দ্রিয়সকল সেই দিব্য রূপকে আকণ্ঠপান করতে লাগল। নৃপতিদের পাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে তো পূর্বেই বিধৌত হয়ে গিয়েছিল। তারা শ্রীভগবানের কৃপায় তখন সর্বসুখের আকর হয়ে গিয়েছিল। ভাবাবেগে তারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মস্তক অবনত করে প্রণাম নিবেদন করল। বন্দিজীবনের ক্লেশসকল তখন ঈশ্বর দর্শনের আনন্দে অন্তর্ধান করেছিল। তারা প্রণতি নিবেদন করে স্তুতি করল :

**নমস্তে দেবদেবেশ প্রপন্নার্তিহরাব্যয়।**
**প্রপন্নান্ পাহি নঃ কৃষ্ণ নির্বিণ্নান্ ঘোরসংসৃতেঃ॥** (১০।৭৩।৮)

হে দেবাদিদেব ! হে শরণাগতবৎসল ! হে অবিনশ্বর সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন। ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনি আমাদের ভববন্ধন থেকে মুক্তি প্রদান করুন।

ভগবন্ ! নৃপতি হয়েও রাজ্যচ্যুত হওয়াকে আমরা আপনার বিশেষ অনুগ্রহ বলেই মনে করি কারণ ঐশ্বর্যে মদমত্ত নৃপতির প্রকৃত সুখ লাভ অথবা কল্যাণ হওয়া যে আদৌ সম্ভব হয় না। তখন আপনারই মায়ায় অনিত্য ধনসম্পদকেই শাশ্বত বোধ হয়। নৃপতি হয়ে আমরা মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর আচরণে নিত্যযুক্ত ছিলাম। আপনার কৃপায় আমাদের অহংকার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আমরা আপনার শরণাগত। মানবদেহ দ্বারা রাজ্য ভোগ করবার স্পৃহা আমাদের আর নেই। আপনি আমাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মে নিত্যযুক্ত থাকবার অনুমতি দিন।

**কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।**
**প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥** (১০।৭৩।১৬)

প্রণতজনের ক্লেশহারক শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, হরি, পরমাত্মা এবং গোবিন্দের প্রতি আমাদের বারে বারে প্রণাম।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বিখ্যাত প্রণাম মন্ত্রটি ক্লিষ্ট নৃপতিগণের মুখেই প্রথম নিবেদিত হয়েছিল। নৃপতিদের প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান সুমধুর কণ্ঠে তাদের বললেন— হে নৃপতিগণ ! আকাঙ্ক্ষিত সুদৃঢ় ভক্তিলাভ তোমাদের অবশ্যই হবে। ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য উচ্ছৃঙ্খলা ও মত্ততার কারণ হয়ে থাকে। তোমরা দেহ ও দেহ বিষয়ক বস্তুসমূহে আসক্তি ত্যাগ করে নির্লিপ্ত ভাব রাখবে। নিজ আত্মাতেই রমণ করবে, ভজনে আগ্রহী হবে, আশ্রমোচিত ব্রত সকল পালন করবে। মনকে আমাতে নিত্যযুক্ত রেখে জীবন যাপন করবে। তাহলেই তোমরা আমার ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করতে সমর্থ হবে।

জরাসন্ধপুত্র সহদেব দ্বারা নৃপতিদের রাজোচিত বস্ত্রালংকার, মাল্য-চন্দন প্রভৃতি দান করা হল আর যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করাও হল। উত্তম আহার্য, তাম্বূল দান এবং সম্মান প্রদর্শন শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই করা হল। সুন্দর কুণ্ডল ধারণ করে নৃপতিগণ মেঘমুক্ত শারদগগনে দীপ্তিমান নক্ষত্র সম সৌন্দর্যযুক্ত হলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নৃপতিগণকে মণিকাঞ্চনমণ্ডিত শ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিয়ে উত্তম বিদায় সম্ভাষণে ভূষিত করে তাদের নিজ নিজ রাজধানীতে প্রেরণ করলেন।

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে দিয়ে জরাসন্ধ বধ করিয়ে ভীমসেন ও অর্জুন সহিত জরাসন্ধনন্দন সহদেব দ্বারা সম্মানিত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থ সমীপে উপনীত হয়ে নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি করে বিজয়বার্তা ঘোষণা করলেন যা বান্ধবদের সুখী ও শত্রুদের দুঃখী করল।

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রাজসূয় যজ্ঞের শেষ কণ্টক জরাসন্ধ অপসারিত হল।

———o———

# শ্রীভগবানের অগ্রপূজা ও শিশুপাল উদ্ধার

জরাসন্ধ বধের বিবরণ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে মুগ্ধ করল। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমার অন্ত নেই। সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি প্রসন্নতাপূর্বক বললেন—হে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ! হে অনন্তবীর্য ! আপনার আদেশ তো ত্রিলোকাধিপতি ব্রহ্মা, শংকর ও ইন্দ্রাদি লোকপালগণও পালন করতে সতত উন্মুখ থাকেন কিন্তু সেই আপনিই মর্তলোকে আমাদের মতন দীনহীন নৃপতি জ্ঞানধারণকারীর আদেশও পালন করেন। বস্তুত এইজন্য আমাদের শাস্তি পাওয়াই উচিত। হে অজিত ! হে মাধব ! আপনপর ভেদাভেদ বিরহিত আপনার মহিমা অনন্ত। কী সুন্দর আপনার নরলীলাভিনয়।

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে রাজসূয় যজ্ঞের প্রস্তুতি শুরু হল। ধর্মরাজ যজ্ঞকর্মে নিপুণ বেদবাদী ব্রাহ্মণদের ঋত্বিক ও আচার্যরূপে বরণ নিলেন। বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন— ব্যাসদেব, ভরদ্বাজ, সুমন্ত, গৌতম, অসিত, বশিষ্ট, চ্যবন, কণ্ঠ, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্র, বামদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল, পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, অথর্বা, কশ্যপ, ধৌম্য, পরশুরাম, শুক্রাচার্য, আসুরি, বীতহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন— এবং অকৃতব্রণ সম বিদগ্ধ মুনিঋষিগণ।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, পিতামহ, কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁর দুর্যোধনাদি পুত্রদের ও মহামতি বিদুরকেও আমন্ত্রণ করলেন। রাজসূয় যজ্ঞ দর্শন করতে দেশের সকল নৃপতিগণ, মন্ত্রীগণ ও কর্মচারীগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই সমবেত হলেন।

অতঃপর ঋত্বিকগণ সুবর্ণময় লাঙল দ্বারা যজ্ঞভূমিকে কর্ষণ করিয়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। প্রাচীনকালে যেমন বরুণদেবের যজ্ঞে সকল যজ্ঞপাত্রই সুবর্ণময় ছিল তেমনই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে হল। পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের নিমন্ত্রণে

শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশংকর, শ্রীইন্দ্রাদি লোকপাল ও সিদ্ধগন্ধর্ব, বিদ্যাধর, নাগ, মুনি, যক্ষ, রাক্ষস, পক্ষী, কিন্নর, চারণ সকল ও সপত্নিক নৃপতিগণ এসেছিলেন।

আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সেবার সুবিধার জন্য কার্যসকল বিভাজন করে নেওয়া হয়েছিল। ভীমসেন পাকশালার অধ্যক্ষ, দুর্যোধন কোষাধ্যক্ষ, কর্ণ দাস, সহদেব আদর আপ্যায়ন ও নকুল দ্রব্য গ্রহণ আদি কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। অর্জুন গুরুজনদের সেবা-শুশ্রূষা আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমাগত অতিথিবৃন্দের পাদপ্রক্ষালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দেবী দ্রৌপদী ছিলেন পরিবেশনের দায়িত্বে। কার্যভার গ্রহণের মধ্যে ভীমসেন যেহেতু খাদ্যরসিক ছিলেন তাই তাঁর পাকশালার অধ্যক্ষ রূপে চয়ণ করা, তিনি রসযুক্ত খাদ্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানী বলে তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষের দুর্যোধন ও কর্ণকে যথাক্রমে কোষাগার ও দান কার্যদান আমাদের আশ্চর্য করে। দান করলে সম্পদ সতত বৃদ্ধি পায় তাই বোধহয় এই কার্যভার দান।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরই রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে উপযুক্ত ব্যক্তি কারণ তিনি বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের পক্ষে এই কার্যসম্পাদন করা সহজ হবে বলে সকলে মনে করত। অতএব রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন শুরু হল।

রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য কাকে দেওয়া যায় তার উপর বিচার বিবেচনা শুরু হল। প্রশ্নে একমত হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে না দেখে মাদ্রীনন্দন সহদেব বললেন :

**অর্হতি হ্যচ্যুতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।**
**এষ বৈ দেবতাঃ সর্বা দেশকালধনাদয়ঃ॥**

(১০।৭৪।১৯)

যাদবশ্রেষ্ঠ ভক্তবৎসল অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনিই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লাভের প্রকৃত অধিকারী কারণ দেবতাগণ তাঁরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ; দেশ, কাল, সম্পদ ও তাঁরই বিভিন্ন রূপ।

যদাত্মকমিদং বিশ্বং ক্রতবশ্চ যদাত্মকাঃ।
অগ্নিরাহুতয়ো মন্ত্রাঃ সাংখ্যং যোগশ্চ যৎপরঃ ॥

(১০।৭৪।২০)

সমগ্র বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণেরই রূপ। সকল যজ্ঞও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অগ্নি, আহুতি ও মন্ত্ররূপে অধিষ্ঠান করেন। জ্ঞানপথ ও কর্মপথ শ্রীকৃষ্ণ লাভের জন্যই প্রশস্ত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাতে ভেদাভেদের নাম-গন্ধও নেই। তিনি আত্মস্বরূপ সংকল্প দ্বারাই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করে থাকেন। জগতের সকল কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা যে ধর্ম, অর্থ, কর্ম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ সাধিত হয় তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেই হয়ে থাকে। অতএব সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লাভের অধিকারী। তাঁর পূজায় প্রাণীদের সঙ্গে নিজেরও পূজা হবে।

সর্বভূতাত্মভূতায় কৃষ্ণায়ানন্যদর্শিনে।
দেয়ং শান্তায় পূর্ণায় দত্তস্যানন্ত্যমিচ্ছতা ॥

(১০।৭৪।২৪)

নিজ দান ধর্মকে অনন্ত ভাবসম্পন্ন করবার নিমিত্ত সকল প্রাণী ও বস্তুর অন্তরাত্মা, ভেদাভেদ বিরহিত, পরম শান্ত ও পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করা হোক।

সহদেব নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করে চুপ করে গেলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সভাতে উপস্থিত বিদ্বজ্জন সাধুবাদ দিয়ে সহদেবের উক্তিকে সমর্থন করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদের আদেশ ও বিদ্বৎমণ্ডলীর অভিপ্রায় অবগত হয়ে পরমানন্দে আবেগ বিহ্বল হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। পত্নী, ভ্রাতা, অমাত্য ও কুটুম্বাদিসহ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রেমানন্দ বিহ্বল হয়ে শ্রীভগবানের পাদপ্রক্ষালন করলেন আর সেই পাদোদক মস্তকে ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি শ্রীভগবানকে কৌষেয় পীতাম্বর ও রত্নময় অলংকার উৎসর্গ করলেন। আনন্দে বিহ্বল ধর্মরাজের নয়নবারি, দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ করল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে পূজিত ও বন্দিত হতে দেখে যজ্ঞে উপস্থিত

ব্যক্তিগণ বদ্ধাঞ্জলি হয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন আর প্রণাম নিবেদন করতে লাগলেন। আকাশ থেকে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।

ঘটনাক্রমে সভায় উপস্থিত চেদিরাজ শিশুপালকে উত্তেজিত হতে দেখা গেল। শ্রীকৃষ্ণের গুণগান শ্রবণ যে তার পক্ষে সুখকর নয় তা তো সহজেই অনুমেয়। রুক্মিণীদেবীর বিবাহকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কনেকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া, বিবাহের জন্য প্রস্তুত চেদিরাজ শিশুপালকে তাঁর চিরশত্রু করে রেখেছিল। সে সভায় দাঁড়িয়ে উঠে শ্রীভগবানের নামে দুই হাত তুলে কটূক্তি করতে লাগল। সে বলল—বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানীগুণীদের বুদ্ধি বিপর্যয় হয়েছে। অগ্রপূজা ও অর্ঘ্যদান উদ্দেশ্যে যোগ্যপাত্র নিরূপণে বালক সহদেবের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করা এক হাস্যকর কার্য। যাঁরা যজ্ঞের প্রকৃষ্ট নিয়ম জানেন এমন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই কুলকলঙ্ক গোপালক কেমন করে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য লাভের জন্য বিবেচিত হতে পারে ? কাক কি যজ্ঞের চরু লাভ করবার যোগ্য হয় ? এ বর্ণাশ্রম ভ্রষ্ট ; উচ্চকুলজাতও নয়। এ বেদ ও লোকমর্যাদা লঙ্ঘনকারী ; স্বেচ্ছাচারী। এ সদ্‌গুণ বিরহিত তাহলে এ অগ্রপূজা পায় কেমন করে ?

এইভাবে আরও অনেক অপমানজনক কটু কথা বলে শিশুপাল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইসকল কথার উত্তর না দিয়ে অবিচল রইলেন। বিদ্বজ্জনের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত কটু কথা সহ্য করা সকলের পক্ষে সম্ভব হল না। তাঁরা হাত দিয়ে কান ঢেকে শিশুপালের উদ্দেশ্যে তিরস্কার করতে করতে সক্রোধে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। শিশুপালের অপমানকর বাক্যসকল পাণ্ডব, মৎস্য, কেবায় ও সৃঞ্জয় বংশের নৃপতিদের পক্ষে সহ্য করে বসে থাকা সম্ভব হল না। তাঁরা শিশুপালকে বধ করবার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উঠে এলেন। শিশুপালও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ঢাল ও তরবারি তুলে নিল। বিদ্বজ্জনে পরিপূর্ণ যজ্ঞসভাতেই শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণ সমর্থনকারী রাজাদের বিরুদ্ধে আস্ফালন করতে লাগল।

ভক্তদের অপমান ভগবান কেমন করে সহ্য করেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইবার নিজে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি অনুগত নৃপতিদের শান্ত থাকতে

বললেন আর স্বয়ং সুতীক্ষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা শিশুপালের মস্তক অঙ্গচ্যুত করলেন। শিশুপালের অনুগত নৃপতিদের প্রাণ বাঁচাতে সভা ছেড়ে পলায়ন করতে দেখা গেল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞভূমিকে রক্তাক্ত করে মলিন করতে চাননি। তাই তিনি শিশুপালের মস্তক এমনভাবে ছেদন করলেন যাতে যজ্ঞস্থলে এক বিন্দুও রক্তপাত না হয়।

যেমন আকাশ থেকে বিচ্যুত উল্কা পৃথিবীতে বিলীন হয়ে যায় তেমন ভাবেই সকলের দৃষ্টির সম্মুখেই শিশুপালের দেহ থেকে এক জ্যোতি নির্গত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিলীন হয়ে গেল। এই একই ঘটনা পরে আবার ঘটতে দেখা গিয়েছিল তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দন্তবক্রকে বধ করেছিলেন আর তার দেহ থেকেও তেজরাশি নির্গত হয়ে শ্রীভগবানের অঙ্গে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ঘটনা বৃত্তান্ত ভক্তবৃন্দের জানা আবশ্যক। এই শিশুপাল ও দন্তবক্র বধ করবার প্রয়োজন ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের—কারণ তাঁর নরদেহে আগমনের তা যে অন্যতম কারণ। এঁরা পূর্বজন্মে বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় ও বিজয় ছিল। ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাদের তিন বার রাক্ষস জন্মগ্রহণ, কিন্তু পরম কৃপাময় শ্রীহরি দ্বারী জয়-বিজয়কে উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে চান। শ্রীভগবান নিজ মুখে বলেছেন—সাধুদিগের রক্ষার জন্য, পাপীদের বিনাশের জন্য ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই (গীতা ৪।৭)।

জয় ও বিজয়ের প্রথম রাক্ষস জন্ম হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে। দুইজনই প্রচণ্ড শ্রীহরি বিদ্বেষী। বিদ্বেষ এত প্রবল যে প্রবল শক্তিমান শ্রীহরি স্মরণে-মননে তাদের সঙ্গে সতত নিত্যযুক্ত। তাই শ্রীভগবানের আয়োজন হয়েছিল বরাহ অবতার ও নৃসিংহ অবতার রূপে তাঁর প্রিয় দ্বারী জয়-বিজয়কে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় রাক্ষস জন্মে তারাই আবার রাবণ ও কুম্ভকর্ণ। আবার তাদের উদ্ধার করতে শ্রীভগবানের আগমন হল শ্রীরামাবতার রূপে। এবারেও তারা শ্রীহরির প্রবল বিদ্বেষী। তাদেরও উদ্ধার হল। জয়-বিজয়ের তৃতীয় রাক্ষস জন্ম শিশুপাল ও দন্তবক্ররূপে। আবার তারা শ্রীহরির বিদ্বেষযুক্ত। শ্রীহরি তখন পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে এসে আবার তাদের উদ্ধার করলেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমরা আশ্চর্য হয়ে দেখি ; প্রতিবারই

শ্রীভগবানের দ্বারা নিহত হয়ে উন্মত্ত শ্রীহরিবিদ্বেষী রাক্ষসদের দেহ থেকে এটা জ্যোতিরূপে নির্গত হয়ে শ্রীভগবানের অঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। শ্রীভগবান যাকে নিজ হস্তে বধ করছেন তার তো অবশ্যই মুক্তি লাভ করাই যে নিশ্চিত তা তো না হয় বোঝা গেল কিন্তু তিনি শ্রীহরি বিদ্বেষীদের আপন করে নিচ্ছেন তা ভাবতে যেন মন চায় না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রতিবার আমরা দেখি যে তাদের মধ্যে বিদ্বেষ এত প্রচণ্ড যে তারা এক মুহূর্তও শ্রীভগবানকে ভুলতে পারেনি আর তাঁর স্মরণ-মননেই নিত্যযুক্ত থেকেছে। ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব বিরহিত শ্রীভগবান ভক্তের নিত্যযুক্ত থেকে স্মরণ-মননেই সন্তুষ্ট, সেখানে কেউ বিদ্বেষযুক্ত থাকলেও তিনি তা গ্রাহ্য করেন না। এমন একজন যে মায়ায় বিভ্রান্ত হয়ে তাঁকে ভুলে যায়নি তাকে তো শ্রীভগবান উদ্ধার করবেনই। তাই প্রয়োজন তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত থেকে স্মরণ-মনন করা। যে শিশু 'বাবা' বলে ডাকতে পারেনা তাকে কি বাবা অন্যদের চেয়ে কম ভালোবাসেন ? তাই নিত্যযুক্ত থাকবার জন্য কলিকালে নাম সংকীর্তনের বিধান। নাম সংকীর্তন ও জপে নিত্যযুক্ত থাকলেই তো তিনি উদ্ধার করবেনই।

রাজসূয় যজ্ঞের অন্যান্য কার্যাদি উত্তম ভাবে সুসম্পন্ন হল। দাহ, সম্মান প্রদর্শন সবই যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হল। ঋত্বিকগণ বিশেষভাবে বস্ত্রালংকার, দক্ষিণা ও দানাদি দ্বারা পূজিত হলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী সহিত পত্নীসংযাত ও গঙ্গায় যজ্ঞান্ত স্নান করিয়ে ঋত্বিকগণ যজ্ঞ সুসম্পন্ন ঘোষণা করলেন। সর্বত্র আনন্দোৎসব পালিত হতে দেখা গেল। প্রসন্নতাপূর্বক অভ্যাগতগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করলেন।

ধর্মরাজের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরও কিছু দিন সেইখানে থেকে যেতে হল।

———o———

# পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজ উদ্ধার

ভগবান শ্রীবলরাম তখন ব্রজভূমিতে গমন করেছেন। করুষরাজ পৌণ্ড্রক মোসাহেবদের কথায় বিশ্বাস করে নিজেকেই ভগবান বাসুদেব ভেবে বসল আর বালকোচিত ব্যবহার করতে লাগল। অচিন্ত্যগতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও মাহাত্ম্য না জেনেই সে দ্বারকায় দূত প্রেরণ করে হাস্যকর ঘটনা সৃষ্টি করল। পৌণ্ড্রকের দূত দ্বারকায় এসে রাজসভায় উপবিষ্ট কমলনয়ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তার রাজার বার্তা নিবেদন করল :

'আমিই প্রকৃত বাসুদেব। অন্য কেউ নয়। জীবের উপর অনুগ্রহ করে আমার অবতাররূপে আগমন হয়েছে। তুমি যে নিজেকে 'বাসুদেব' রূপে পরিচয় দাও তা অনুচিত ; তাই এখনই তা পরিহার করো। ওরে যাদব ! আমার সকল চিহ্ন ধারণ করে তুমি মূঢ়তা করছ। অবিলম্বে সেই সকল ত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। আমার কথা তোমার গ্রহণযোগ্য না মনে হলে তুমি যুদ্ধ করলেই বুঝতে পারবে যে কে আসল বাসুদেব।'

মন্দমতি পৌণ্ড্রকের এই দম্ভপূর্ণ কথা শ্রবণ করে মহারাজ শ্রীউগ্রসেন সহিত অন্যান্য সভাসদগণ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। শান্ত থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের ঔদ্ধত্যের উত্তর দিয়ে দূতকে বললেন— তোমার রাজার কাছে আমার বার্তা নিয়ে যাও। বার্তা এইরূপ :

'ওরে মূঢ় ! আমার চক্রাদি চিহ্ন ত্যাগ করবার প্রশ্নই ওঠে না। যাদের প্ররোচনায় তুই এইরকম উদ্ধত আচরণ করছিস তাদের সঙ্গে তুইও যখন আমার নিক্ষিপ্ত চক্রে বধ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত থাকবি তখন তো সব মাংসভোজী পক্ষীদের খাদ্য হয়ে উঠবে। আমার শরণদাতা না হয়ে তুই সেই মাংসভোজী সারমেয়দের শরণাগত হয়ে যাবি।'

শ্রীভগবানের তিরস্কার সম্পন্ন বার্তা দূতের মাধ্যমে পৌণ্ড্রকের কাছে পৌঁছে গেল। পৌণ্ড্রক তখন তার সুহৃদ কাশীরাজের কাছে অবস্থান করছিল। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করে কাশী আক্রমণ করলেন।

আক্রমণের সংবাদ পেয়েই মহারথী পৌণ্ড্রক দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তৎক্ষণাৎ নগর থেকে বেরিয়ে এল।

কাশীরাজ পৌণ্ড্রকের সুহৃদ, তাই সেও তার বন্ধুকে সাহায্য করবার জন্য তিন অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে এগিয়ে এল। এইবার শ্রীভগবানের দৃষ্টি পৌণ্ড্রকের উপর পড়ল। পৌণ্ড্রকও শঙ্খ, চক্র, তরবারি, গদা, শার্ঙ্গ ধনু ও শ্রীবৎস চিহ্নাদি ধারণ করে ছিল। তার বক্ষঃস্থলে ছিল কৃত্রিম কৌস্তুভমণি ও বনমালা। অঙ্গে ছিল কৌষেয় পীতাম্বর। রথধ্বজে সে গরুড়চিহ্নও লাগিয়ে রেখেছিল। তার মস্তকে অমূল্য কিরীট ও কর্ণদ্বয়ে মকরাকৃতি জ্যোতির্ময় কুণ্ডল ছিল। তাকে দেখে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা মনে হচ্ছিল। নিজের অনুকরণে তাকে সজ্জিত হতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন।

শত্রুপক্ষ শ্রীভগবানের উপর ত্রিশূল, গদা, পরিঘ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, তোমর, তরবারি, পট্টিশ ও শর দ্বারা আঘাত হানতে শুরু করল। প্রলয় কালীন অগ্নিসম ভগবানের অস্ত্রাদি পৌণ্ড্রক ও কাশীরাজের চতুরঙ্গ সৈন্য তছনছ করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র ভগবান ভূতনাথের ভয়ংকর ক্রীড়াস্থল হয়ে গেল।

এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রককে বললেন— 'ওহে পৌণ্ড্রক ! তুই বার্তায় আমাকে তোর চিহ্ন অস্ত্রশস্ত্রাদি ত্যাগ করতে বলেছিলিস। তাই আমি তা তোর উপরই ত্যাগ করছি। তুই অনর্থক আমার 'বাসুদেব' নাম ধারণ করেছিস। ওরে মূর্খ ! এইবার আমি তোকে নামবিহীন করে দিচ্ছি। তুই বেঁচে থাকলে তবেই তো তোর শরণাগত হয়ে থাকার কথা !'

এইভাবে তিরস্কার করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রকের রথ চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেললেন আর যেভাবে ইন্দ্র তার বজ্র প্রয়োগ করে পর্বতশিখর ধ্বংস করেছিলেন তেমন ভাবেই শ্রীভগবান চক্রদ্বারা পৌণ্ড্রকের মস্তক ছেদন করলেন। শ্রীভগবান শরাঘাতে কাশীরাজের মস্তকও অঙ্গচ্যুত করে আকাশ পথে কাশীনগরে নিক্ষেপ করলেন। মনে হল যেন বায়ু হেলায় পদ্মকোষকে ছিন্ন করে ফেলল। শত্রুভাবাপন্ন পৌণ্ড্রক ও তার সখা কাশীরাজকে বধ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে এলেন।

স নিত্যং ভগবদ্ধ্যানপ্রধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ।
বিভ্রাণশ্চ হরে রাজন্ স্বরূপং তন্ময়োঽভবৎ॥

(১০।৬৬।২৪)

পৌণ্ড্রক শ্রীভগবানের বৈরীভাবাপন্ন থেকে সতত তাঁকে চিন্তা করত তাই তার বন্ধন মুক্ত হল। সে শ্রীভগবানের অনুরূপ কৃত্রিম বেশ ধারণ করে থাকত। তাই সতত শ্রীভগবানের রূপে নিত্যযুক্ত থাকায় সে শ্রীভগবানের সারূপ্যই লাভ করল।

ওদিকে কাশীতে রাজপ্রাসাদের দ্বারে এক কুণ্ডলমণ্ডিত নরমুণ্ড দেখে জনগণ আশ্চর্য হয়ে গেল। যখন সকলে বুঝল যে তা আসলে কাশীরাজেরই মুণ্ড তখন তারা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কাশীরাজের পুত্র সুদক্ষিণ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি সমাপন করে প্রতিশোধ নেওয়ার কথা বিবেচনা করল। সে পিতৃহন্তাকে বধ করে পিতৃঋণ পরিশোধ করবার সংকল্প গ্রহণ করল ও নিজ কুলপুরোহিত ও আচার্যের সাহায্যে একাগ্রচিত্তে ভগবান শংকরে আরাধনায় যুক্ত হল। ভগবান শংকরের কাছে জানতে পেরে সুদক্ষিণ অনুষ্ঠান সকল নিয়মমত পালন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিচার (মারণ পুরশ্চরণ) করতে শুরু করল।

অভিচার কার্য সম্পন্ন হতেই যজ্ঞকুণ্ড থেকে অতি ভীষণদর্শন অগ্নিমূর্তি দেখা গেল। সেই উত্তপ্ত তাম্রবর্ণ শ্মশ্রু-গুম্ফ ও বক্র ভ্রূকুটি থেকে যেন ক্রূরতা বর্ষণ হচ্ছিল। মূর্তি জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠ প্রান্ত দ্বারা লেহন করছিল। তালবৃক্ষসম বৃহৎ পদদ্বয়যুক্ত সেই ভয়ংকর মূর্তি প্রবল বেগে ভূতল কম্পিত ও লেলিহান শিখা দ্বারা দশ দিক দগ্ধ করতে করতে দ্বারকা অভিমুখে ধাবিত হল। প্রচুর সংখ্যায় অগ্নিময় প্রমথগণও তার সঙ্গে ছিল।

পাশা খেলায় ব্যস্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানলেন যে এক ভয়ংকর অগ্নি দ্বারকাকে ভস্মীভূত করতে উদ্যতে হয়েছে। সকলকে ভীত দেখে তিনি অভয় দান করলেন। সর্বজ্ঞ শ্রীভগবান জানলেন যে অগ্নি আসলে কাশী থেকে আগত মাহেশ্বরী কৃত্যা। তিনি পার্শ্বস্থ সুদর্শনচক্রকে তাকে প্রতিহত করতে আদেশ দিলেন। কোটি কোটি সূর্য সম তেজোময় ও প্রলয়কালীন অগ্নিসম জ্যোতির্ময় সুদর্শনের তেজে আকাশ, দিগ্‌দিগন্ত ও অন্তরীক্ষ প্রদীপ্ত

হয়ে উঠল। তা সেই অভিচার অগ্নিকে নিপীড়িত করল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র সুদর্শনচক্রের শক্তিতে কৃত্যারূপ অগ্নি ভগ্নমুখ হয়ে গেল। শক্তি কুণ্ঠিত হল ও তেজ নষ্ট হল। মাহেশ্বরী কৃত্যা দ্বারকা থেকে পলায়ন করে কাশীতে উপস্থিত হল আর আচার্যদের সঙ্গে সুদক্ষিণকে দগ্ধ করে ভস্ম করে দিল। এইভাবে অভিচার দ্বারা সে নিজের বিনাশের কারণ হল।

কৃত্যাকে অনুসরণ করে সুদর্শন চক্রও কাশীতে উপস্থিত হল। বৃহৎ অট্টালিকায় সুসজ্জিত কাশীকেও সুদর্শনচক্র রেহাই দিল না। তা কাশীকে দগ্ধ করে ভস্মীভূত করে দিল। অতঃপর সে পরমানন্দময় লীলাসম্পাদনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে গেল।

---o---

# বিভূতিযোগ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় ও সেবক উদ্ধব যখন জানতে পারলেন যে শ্রীপ্রভু তাঁর নরলীলা সংবরণ করে স্বধাম গমনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তখন তিনি প্রভুর কাছে ছুটে এসে তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করে বললেন—হে জীবনসর্বস্ব শ্যামসুন্দর ! আপনাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আপনি আমাকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। আপনার বিয়োগ ব্যথা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব কেমন করে হবে ?

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন— যদুবংশ ব্রাহ্মণদের অভিশাপে ভস্ম হয়েই আছে। আজ থেকে সপ্তমদিবসে সমুদ্র দ্বারকাপুরীকে জলপ্লাবিত করবে। আমার মর্ত্যলোক ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সকল মঙ্গলের অবসান হবে আর কলিযুগের সূচনা হবে। তখন তোমার সেইখানে না থাকাই ভালো কারণ কলিযুগে জনগণ অধর্ম পরায়ণ হবে। তখন সকলের সঙ্গে স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে আমাতে মন নিত্যযুক্ত রেখে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করলে তোমার মঙ্গল হবে।

শ্রীভগবানের আদেশ শিরোধার্য করে সেবক উদ্ধব তাঁর কাছ থেকে জানতে চাইলেন :

**যেষু যেষু চ ভাবেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ।**
**উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্ বদস্ব মে॥**

(১১।১৬।৩)

সুমহান মুনিঋষিগণ ভক্তি সহকারে আপনার যে রূপের ও বিভূতির উপাসনা করে সিদ্ধিলাভ করেন তা আমাকে বলুন। ত্রিভুবনে দিগ্‌দিগন্তে আপনার প্রভাবযুক্ত যে বিভূতিসকল ছড়িয়ে আছে তা আমাকে চিনিয়ে দিন।

শ্রীভগবান উত্তর দিলেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! প্রশ্ন অতি উত্তম। একই প্রশ্ন কুরুক্ষেত্রে অর্জুনও আমাকে করেছিল। অর্জুন যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইলে আমি বীর শিরোমণিকে সেই কথা বলে আমার অভীষ্ট কার্যে

তাকে যুক্ত করে ছিলাম। হে উদ্ধব ! আমি সকল প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী, সুহৃদ ও নিয়ামক ঈশ্বর। স্থাবর-জঙ্গমরূপে আমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আমার কারণেই হয়। আমার বিভূতির শেষ নেই। তোমার অবগতির জন্য কিছু বলছি, শুনে রাখো।

গতিশীল বস্তুতে আমি গতি। আমি কালরূপে শাসন করি। গুণে আমি তার মূলস্বরূপ সাম্যাবস্থা আর গুণযুক্ত বস্তুতে আমি গুণ। গুণযুক্ত বস্তুতে আমি ক্রিয়াপ্রধান প্রথম কার্য সূত্রাত্মা আর মহানে জ্ঞান শক্তি প্রধান প্রথম কার্য মহত্তত্ত্ব।

**হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ।**
**অক্ষরাণামকারোঽস্মি পদানিচ্ছন্দসামহম্॥**

(১১।১৬।১২)

আমি বেদের অভিব্যক্তি স্থান হিরণ্যগর্ভ আর মন্ত্রে ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁকার। আমি অক্ষর সমূহের মধ্যে 'অ' কার ও ছন্দোবিশিষ্ট ঋকসমূহের মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র।

সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, অষ্টবসুর মধ্যে অগ্নি, দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু ও একাদশ রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত রুদ্র।

আমি ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, রাজর্ষিদের মধ্যে মনু, দেবর্ষি গণের মধ্যে নারদ আর গাভীদের মধ্যে কামধেনু।

সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে আমি কপিল মুনি, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়, প্রজাপতিদের মধ্যে দক্ষ প্রজাপতি ও পিতৃপুরুষদের মধ্যে অর্যমা।

প্রিয় উদ্ধব ! আমি দৈত্যদের মধ্যে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, নক্ষত্রদের মধ্যে চন্দ্র, ঔষধির মধ্যে সোমরস এবং যক্ষ-রাক্ষসদের মধ্যে কুবের। এই কথা জেনে রাখো।

আমি গজরাজদের মধ্যে ঐরাবত, জলচরদের মধ্যে তাদের প্রভু বরুণ, উত্তাপ ও আলোক বিতরণকারীদের মধ্যে সূর্য ও মানবদের মধ্যে রাজা।

আমি অশ্বদের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, ধাতুদের মধ্যে সুবর্ণ, দণ্ডধারীদের মধ্যে যম আর সর্পদের মধ্যে বাসুকি।

হে নিষ্পাপ উদ্ধব ! আমি নাগরাজাদের মধ্যে শেষ নাগ, কেশর

শৃঙ্গযুক্ত প্রাণীদের মধ্যে তাদের রাজা সিংহ, আশ্রমসমূহের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রম ও বর্ণ সমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ।

আমি তীর্থ ও নদী সমূহের মধ্যে গঙ্গা, জলাশয় সমূহের মধ্যে সাগর, অস্ত্রশস্ত্রসমূহের মধ্যে ধনুক ও ধনুর্ধরদের মধ্যে ত্রিপুরারি শংকর।

নিবাসস্থানের মধ্যে আমি সুমেরু, দুর্গম স্থান সমূহের মধ্যে হিমালয় ; বনস্পতিসমূহের মধ্যে অশ্বত্থ ও শস্যসমূহে যব।

**পুরোধসাং বসিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ।**
**স্কন্দোঽহং সর্বসেনান্যামগ্রণ্যাং ভগবানজঃ॥**

(১১।১৬।২২)

আমি পুরোহিতদের মধ্যে বশিষ্ঠ, বেদবেত্তাদের মধ্যে দেবগুরু বৃহস্পতি। সেনাপতিদের মধ্যে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় ও সন্মার্গ প্রবর্তকের মধ্যে ভগবান ব্রহ্মা।

আমি পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ, ব্রতসমূহের মধ্যে অহিংসা ব্রত, পরিশোধনকারী বস্তুদের মধ্যে নিত্যশুদ্ধ বায়ু, অগ্নি, সূর্য, জল, বাণী ও আত্মা।

অষ্টযোগের মধ্যে আমি মন নিরোধক সমাধি, বিজয়-ইচ্ছুকদের মধ্যে মন্ত্র (নীতি) বল, কৌশল সমূহের মধ্যে আত্ম-অনাত্ম বিবেকরূপ কৌশল ও খ্যাতি বাদীদের মধ্যে বিকল্প।

নারীগণের মধ্যে আমি মনুপত্নী শতরূপা, পুরুষদের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু। শ্রেষ্ঠ মুনিদের মধ্যে নারায়ণ ও ব্রহ্মচারীদের মধ্যে সনৎকুমার।

ধর্মে আমি কর্মসন্ন্যাস। আমি অভয় সাধনের মধ্যে আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান। অভিপ্রায় গোপন সাধনের মধ্যে আমি মধুর বচন ও মৌন, নারী-পুরুষের যুগলের মধ্যে প্রজাপতি।

সতত সাবধান ও সদাজাগ্রতদের মধ্যে আমি সংবৎসররূপ কাল, আমি ষড় ঋতুর মধ্যে পুষ্পাকর বসন্ত। দ্বাদশ মাসের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ ও নক্ষত্রগণের মধ্যে অভিজিৎ।

যুগ চতুষ্টয়ের মধ্যে আমি সত্যযুগ, বিবেচকদের মধ্যে দেবর্ষি দেবল ও অসিত। ব্যাসদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস ও কবিগণের মধ্যে মনস্বী

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য।

**বাসুদেবো ভগবতাং ত্বং তু ভাগবতেষ্বহম্।**
**কিংপুরুষাণাং হনুমান্ বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ॥**
(১১।১৬।২৯)

বিশিষ্ট মহাপুরুষ ভগবানের মধ্যে আমি বাসুদেব। আমার প্রেমী ভক্তকুলের মধ্যে আমি তুমি (উদ্ধব), কিম্পুরুষদের মধ্যে হনুমান। বিদ্যাধরদের মধ্যে সুদর্শন আমিই।

আমি রত্নসমূহে পদ্মরাগ, সুন্দর বস্তুসমূহে কমল কলি, তৃণসমূহে কুশ ও হবিষ্যতে গব্যঘৃত।

আমি ব্যবসায়ীদের লক্ষ্মী, ছলচাতুরিযুক্তদের মধ্যে অক্ষক্রীড়ারূপ ছল, তিতিক্ষুদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাত্ত্বিক পুরুষদের মধ্যে সত্ত্বগুণ।

**ওজঃ সহো বলবতাং কর্মাহং বিদ্ধি সাত্ত্বতাম্।**
**সাত্ত্বতাং নবমূর্তীনামাদিমূর্তিরহং পরা॥**
(১১।১৬।৩২)

আমি বলবানদের মধ্যে উৎসাহ ও পরাক্রম আর ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে ভক্তিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম। বৈষ্ণবদের পূজ্য বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ এবং ব্রহ্মা এই নয় মূর্তির মধ্যে আমি প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূর্তি বাসুদেব।

আমি গন্ধর্বদের মধ্যে বিশ্বাবসু এবং অপ্সরাদের মধ্যে ব্রহ্মার রাজসভার অপ্সরা পূর্বচিত্তি। আমি পর্বতদের মধ্যে স্থিরতা, পৃথিবীর শুদ্ধ অধিকৃতি গন্ধ।

আমি জলে রস, তেজস্বীগণের মধ্যে পরম তেজস্বী অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও তারাদের মধ্যে প্রভা আর আকাশে তার একমাত্র গুণ শব্দ।

হে উদ্ধব ! আমি ব্রাহ্মণ-ভক্তদের মধ্যে বলি, বীরদের মধ্যে অর্জুন ও প্রাণীদের মধ্যে তাদের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।

আমি পদে চলৎশক্তি, বাণীতে বাক্‌শক্তি, পায়ুতে পায়ুস্খালন শক্তি, হস্তে মুষ্টিবদ্ধ শক্তি এবং জননেন্দ্রিয়তে আনন্দভোগ শক্তি। ত্বকে স্পর্শের, নেত্রে দর্শনের, রসনায় স্বাদ গ্রহণের, কর্ণে শ্রবণের এবং নাসিকায় আঘ্রাণ

শক্তি আমিই। ইন্দ্রিয় সমূহের ইন্দ্রিয় শক্তি আমিই।

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজ, জল, অহংকার, পঞ্চমহাভূত, জীব, অব্যক্ত, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তম ও সীমাহীন ব্রহ্ম সবই আমি। আমিই সকলের আত্মা। আমি ছাড়া অন্য কিছু নেই।

আমার বিভূতিসকল গণনা করে শেষে করা যায় না। মনে রেখো, যাতে তেজ, শ্রী, কীর্তি, ঐশ্বর্য, লজ্জা, ত্যাগ, সৌন্দর্য, সৌভাগ্য, পরাক্রম, তিতিক্ষা এবং বিজ্ঞানাদি শ্রেষ্ঠগুণ আছে তা আমারই অংশ। সংক্ষেপে বিভূতিসকল বর্ণিত হল।

হে উদ্ধব ! তাই তুমি বাণীকে স্বচ্ছন্দ বাঙ্ময়তা থেকে বিরত করো। মনের সংকল্প-বিকল্প ত্যাগ করো। তার জন্য প্রাণবায়ুকে বশীভূত করো আর ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করো। সাত্ত্বিক বুদ্ধি দ্বারা প্রপঞ্চাভিমুখ বুদ্ধিকে শান্ত কর। তাহলে তোমাকে ভবগতায়াতের চক্রে পড়ে আবর্তিত হতে হবে না।

———o———
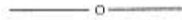
# ভাগবতধর্ম নিরূপণ ও উদ্ধবের বদরিকাশ্রম গমন

সেবক উদ্ধবের বহু প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন কিন্তু শ্রীভগবানের লীলা সংবরণের পর ঠিক কী করা উচিত তা সেবকের কাছে তখনও স্পষ্ট হচ্ছিল না। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

**সুদুশ্চরামিমাং মন্যে যোগচর্যামনাত্মনঃ।**
**যথাঞ্জসা পুমান্ সিদ্ধ্যেৎ তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত॥**

(১১।২৯।১)

হে অচ্যুত ! যে মনকে বশীভূত করতে সক্ষম হয়নি তার পক্ষে আপনার বলা যোগসাধনায় যুক্ত হওয়া অতিশয় কঠিন বলেই আমার মনে হয়। অতএব আপনি এইবার আমাকে এমন কোনো সহজ সরল পথ বলুন যা অনুগমন করে মানব আপনার পরমপদ অনায়াসে লাভ করতে সক্ষম হয়।

উদ্ধবের কথা শ্রবণ করে শ্রীভগবান মৃদু-মন্দ হাস্যসহ বললেন :

**হন্ত তে কথয়িষ্যামি মম ধর্মান্ সুমঙ্গলান্।**
**যাচ্ছ্রদ্ধয়াহহচরন্ মর্ত্যো মৃত্যুং জয়তি দুর্জয়ম্॥**

(১১।২৯।৮)

হে প্রিয় উদ্ধব ! এইবার আমি তোমাকে সেই মঙ্গলময় ভাগবতধর্মের উপদেশ দান করব যা শ্রদ্ধা সহকারে আচরণ করে মানব সংসাররূপ দুর্জয় মৃত্যুকে অনায়াসে জয় করতে সমর্থ হবে।

হে উদ্ধব ! আমার ভক্ত যেন তার সকল কর্ম আমার নিমিত্তই করে আর ধীরে ধীরে সকল কার্য সম্পাদন কালে আমার স্মরণ-মননে নিত্যযুক্ত থাকবার অভ্যাস করতেই থাকে। এরফলে অনতিবিলম্বে তার মন ও চিত্ত আমাতে সমর্পিত হয়ে যাবে।

আমার ভক্ত সাধু ব্যক্তিগণ নিবাস স্থানে বাস করেই সেইখানকার দেবতা, অসুর অথবা মানবের মধ্যে যারা আমার অনন্য ভক্ত তাদের

আচরণের অনুসরণ করবে। আমার ভক্তদের অনুসরণ করলেই তারা প্রকৃত পথের সন্ধান পেয়ে যাবে।

**পৃথক্ সত্রেণ বা মহ্যং পর্বযাত্রামহোৎসবান্।**
**কারয়েদ্ গীতনৃত্যাদ্যৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ॥**

(১১।২৯।১১)

উৎসব পালা-পার্বণ কালে ভক্ত সম্মিলিত অথবা এককভাবে নৃত্য, গীত, বাদ্য আদি মহারাজোচিত জাঁকজমক সহকারে আমার শোভাযাত্রা ও জনসমাগম সহিত মহোৎসব পালন করবে।

ভক্ত শুদ্ধান্তঃকরণে আকাশসম বাহ্যান্তরে পরিব্যাপ্ত ও আবরণ বিরহিত পরমাত্মা আমাকেই সকল প্রাণী স্বত্ত পদার্থে আর নিজ অন্তঃকরণে দর্শন করবে। হে নির্মলচিত্ত উদ্ধব ! সাধক যখন এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্থাবর-জঙ্গম সর্বত্র আমাকে প্রত্যক্ষ করতে থাকে আর অনুরূপ আচরণ করে তখন তাকে প্রকৃত জ্ঞানী বলা হয়। ভক্তের তখন ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, চোর-ব্রাহ্মণভক্ত, সূর্য-স্ফুলিঙ্গ ও অক্রূর-ক্রূর সকলের মধ্যেই সমদৃষ্টি হয়। তখন তাকে প্রকৃত জ্ঞানী মনে করবে।

আমার স্মরণ-মননে নিত্যযুক্ত সাধকের ঔদ্ধত্য, ঈর্ষা, তিরস্কার ও অহংকার অচিরেই বিনাশ হয়ে যায়। সাধক স্বজনের উপহাস, দোষদৃষ্টি ও লোকলজ্জা সর্বতোভাবে পরিহার করবে। সর্বত্র আমিই আছি জ্ঞানে ভক্ত আমার শরণাগত হবে। সকল প্রাণীর মধ্যে আমার অবস্থান অর্থাৎ ভগদ্ভাব না আসা পর্যন্ত সাধক কায়মনোবাক্যে সংকল্প ও কর্ম দ্বারা আমার সাধনায় নিত্যযুক্ত থাকবে।

**সর্বং ব্রহ্মাত্মকং তস্য বিদ্যয়াঽঽত্মমনীষয়া।**
**পরিপশ্যন্নুপরমেৎ সর্বতো মুক্তসংশয়॥**

(১১।২৯।১৮)

হে উদ্ধব ! এইভাবে যখন সর্বত্র আত্মবুদ্ধি ব্রহ্মভাবের অভ্যাস হয় তখন অচিরেই সাধকের জ্ঞানের উন্মোচন হয় আর তার সর্বত্র ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়। সে তখন সন্দেহ ও সংশয় নিবৃত হয়ে আমার সাক্ষাৎকার লাভ করে জাগতিক দৃষ্টি থেকে উপরত হয়।

কায়মনোবাক্যে স্থাবর-জঙ্গম সর্বত্র আমার অবস্থানের জ্ঞানে নিত্যযুক্ত হওয়ার পথই আমাকে লাভ করবার সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। এই আমার সুনিশ্চিত অভিমত।

**যো যো ময়ি পরে ধর্মঃ কল্প্যতে নিষ্ফলায় চেৎ।**
**তদায়াসো নিরর্থঃ স্যাদ্ ভয়াদেরিব সত্তম॥**

(১১।২৯।২১)

হে উদ্ধব ! এই আমার একনিষ্ঠ ভাগবতধর্ম যার ফলে নির্গুণ নিষ্কাম হওয়ায় সাধককে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। তাই তা সর্বোত্তম।

**এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধির্মনীষা চ মনীষিণাম্।**
**যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্নোতি মামৃতম্॥**

(১১।২৯।২২)

বিবেকযুক্তর বিবেক ও বুদ্ধিমানের বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা এতেই যে সাধক এই বিনাশী ও অসত্য দেহ দ্বারা আমার অবিনাশী এবং সত্য তত্ত্বকে জেনে নেয়।

হে উদ্ধব ! ব্রহ্মবিদ্যার কথা তোমায় বললাম। আশাকরি তুমি এখন ব্রহ্মস্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম আর তোমার চিত্তের শোক-মোহও নিবারণ হয়েছে। হে প্রিয় উদ্ধব ! জ্ঞান, কর্ম, যোগ, বাণিজ্য রাজার অনুগ্রহ থেকে যথাক্রমে মোক্ষ, ধর্ম, কাম ও অর্থ রূপ ফল লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার মতন আমার একান্ত ভক্তদের জন্য এই চতুর্বিধ ফল স্বয়ং আমিই।

যখন কেউ সকল কর্ম ত্যাগ করে আমার শরণাগত হয় তখন সে আমার বিশেষভাবে প্রিয় হয় ; তখন আমি তাকে জীব-জন্ম থেকে মুক্তি দিয়ে অমৃতস্বরূপ মোক্ষ প্রদান করি আর সে আমার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার স্বরূপ লাভ করে।

শ্রীভগবানের উপদেশ শ্রবণ করে সেবক উদ্ধবের নয়নযুগল প্লাবিত হয়ে উঠল। ভাবাবেগে তখন তিনি বাক্‌শক্তি হারিয়ে ছিলেন। ভাবাবেগ কোনো রকমে আটকে সেবক উদ্ধব বললেন—

**নমোঽস্তু তে মহাযোগিন্ প্রপন্নমনুশাধি মাম্।**
**যথা ত্বচ্চরণাম্ভোজে রতিঃ স্যাদনপায়িনী॥**

(১১।২৯।৪০)

হে মহাযোগেশ্বর ! আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনি কৃপা করে শরণাগত ভক্তকে এমন আদেশ দান করুন যাতে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার অনন্য ভক্তি নিত্যযুক্ত থাকে।

তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন :

**গচ্ছোদ্ধব ময়াঽঽদিষ্টো বদর্যাখ্যং মমাশ্রমম্।**
**তত্র মৎপাদতীর্থোদে স্নানোপস্পর্শনৈঃ শুচি॥**

(১১।২৯।৪১)

হে উদ্ধব ! এইবার তুমি আমার আদেশে বদরীবনে (বদরিকাশ্রমে) গমন করো। বদরিকাশ্রমেই আমার নিত্যনিবাস ও আশ্রম। সেইখানে তুমি আমার পাদপদ্ম বিধৌত গঙ্গাবারি লাভ করবে যার পান ও স্নান পরম পবিত্রতা প্রদানকারী।

অলকানন্দা দর্শন লাভই তোমার পাপ ও সন্তাপ হরণ করবে। হে প্রিয় উদ্ধব ! তুমি বল্কল ধারণ করবে আর বনের ফলমূল ধারণ করে জীবন ধারণ করবে আর কোন পার্থিব ভোগের স্পৃহা না রেখে ঈশ্বর চিন্তায় আত্মমগ্ন থাকবে।

শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ যা কিছুই আসুক তাকে সমান জ্ঞানে সহ্য করবে। ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত রেখে সৌম্য স্বভাবে দিন কাটাবে। শান্তচিত্ত থাকবে। সমাহিত বুদ্ধিতে তুমি স্বয়ং আমার স্বরূপ-জ্ঞান ও অনুভবে নিত্যযুক্ত থাকবে।

আমি তোমাকে যা কিছু শিক্ষা প্রদান করেছি তা নির্জনে বিচারপূর্বক অনুভব করতে থেকো। নিজ বাণী ও চিত্ত আমাতে নিত্যযুক্ত রাখবে আর আমার কথিত ভাগবতধর্মের প্রীতিতে মগ্ন হয়ে যাবে। অবশেষে তুমি ত্রিগুণ আর তার সঙ্গে সম্বন্ধকারী গতিসকল অতিক্রম করে তার অতীত আমার পরমার্থ স্বরূপে একাকার হয়ে যাবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে নিজ মুখে এইরূপ উপদেশ দান করলে উদ্ধব এইবার উঠে দাঁড়ালেন ও শ্রীভগবানকে পরিক্রমা করে অবনত হয়ে তাঁর শ্রীচরণে মস্তক স্থাপন করলেন। তিনি শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হয়ে গিয়েছিলেন তবুও তাঁর বিদায় গ্রহণকালে চিত্ত

প্রেমাবেগে পূর্ণ হয়ে পড়ল। তাঁর প্রীতি বাঁধ ভেঙে নয়নবারি রূপে শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে সিক্ত করে দিল।

শ্রীভগবানকে ভালোবেসে তাঁকে ত্যাগ করা কি আদৌ সম্ভব ? শ্রীভগবানের বিয়োগের কল্পনায় উদ্ধব কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁকে ছেড়ে যেতে তাঁর মন চাইছিল না। তিনি বারে বারে মূর্ছিত হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদুকা নিজ মস্তকে ধারণ করলেন আর বারে বারে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে যাত্রা করলেন। শ্রীভগবানের পরম প্রেমী ভক্ত উদ্ধব, চিত্তে তাঁর প্রভুর দিব্যরূপ ধারণ করে বদরিকাশ্রম পৌঁছালেন। সেইখানে তিনি তাপস জীবন যাপন করে জগতের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁর স্বরূপভূত পরমগতি লাভ করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথিত উদ্ধবকে দান করা এই জ্ঞানামৃত আনন্দ-মহাসাগরের সার বস্তু। পরম আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ তো তার সেবনেই সম্ভব।

———o———

প্রেমাবেগে পূর্ণ হয়ে পড়ল। তাঁর প্রীতি বাঁধ ভেঙে নয়নবারি রূপে শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে সিক্ত করে দিল।

শ্রীভগবানকে ভালোবেসে তাঁকে ত্যাগ করা কি আদৌ সম্ভব ? শ্রীভগবানের বিয়োগের কল্পনায় উদ্ধব কাতর হয়ে পড়লেন। তাঁকে ছেড়ে যেতে তাঁর মন চাইছিল না। তিনি বারে বারে মূর্ছিত হয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদুকা নিজ মস্তকে ধারণ করলেন আর বারে বারে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে যাত্রা করলেন। শ্রীভগবানের পরম প্রেমী ভক্ত উদ্ধব, চিত্তে তাঁর প্রভুর দিব্যরূপ ধারণ করে বদরিকাশ্রম পৌঁছালেন। সেইখানে তিনি তাপস জীবন যাপন করে জগতের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে তাঁর স্বরূপভূত পরমগতি লাভ করলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কথিত উদ্ধবকে দান করা এই জ্ঞানামৃত আনন্দ-মহাসাগরের সার বস্তু। পরম আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ তো তার সেখানেই সম্ভব।

———○———